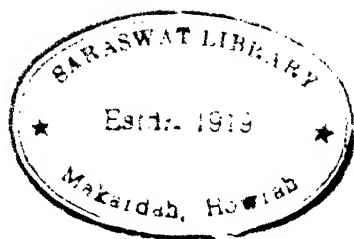


2090



ধূসর পথের ধূলা

(উপন্যাস)

শ্রীগোরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত

প্রবর্তক পার্বলিশিং হাউস

৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

প্রকাশক—

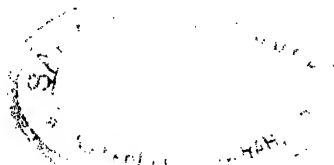
শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী বি-এ

প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস

৬১ নং পল্লবাজার ষ্ট্রট, কলিকাতা।

মূল্য দুইটাকা।

গ্রন্থ-স্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।



প্রিণ্টার—শ্রীশঙ্করম্বর মিত্র

সঞ্জীবনী প্রেস

৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রট

কলিকাতা।

আমার পরলোকগত

দাদামণির

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

উৎসর্গীকৃত হইল ।

—শ্রীগোরাধ গোপাল সেনগুপ্ত

ভবানীপুর (বীরভূম)

জন্মাষ্টমী—১৩৫২ সাল ।

এই পুস্তকের সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র কল্পনা প্রসূত ।

“জীবন-পোড়ানো এ হোম-অনল
সেদিন কি হবে সহসা সফল,
সেই শিখা হতে রূপ-নির্মল
বাহিরি আসিবে বুদ্ধি।
সব জটিলতা হইবে সরল
তোমাতে পাইব খুঁজি।”

—রবীন্দ্রনাথ

শীতকালের রাত্রি ।

রামময় ঘোষালের রুদ্ধদ্বার বৈঠকখানায় বসিয়া ঘোষাল মহাশয় চাটুয্যো পাড়ার ভবতারণ চাটুয্যোর সহিত দাবা খেলায় নিমগ্ন ছিলেন । অদূরস্থ বাশঝাড় হইতে একদল শূগাল চীংকার করিয়া উঠায় চাটুয্যো মশায় ও ঘোষাল মশায় উভয়েরই বোধ হইল—রাত্রি হইয়াছে; এইবার খেলা বন্ধ করা উচিত । সে দানটা খেলা শেষ হইতেই চাটুয্যো মশায় লাঠিটা লইয়া উঠিয়া পড়িলেন । এক কোণে তিনি তাঁহার হারিকেন লণ্ঠনটা রাখিয়া দিয়াছিলেন । অথবা তৈল বায়ের আশঙ্কায় ফিতাটা এত নামাইয়া দিয়াছিলেন যে, সেটা তৎক্ষণাৎ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল । ঘোষালের লণ্ঠনটা লইয়া ইতস্ততঃ দূকপাত করিয়া চাটুয্যো মহাশয় একটা খড় কুড়াইয়া লইলেন এবং ঐক্ল শলাকার সাহায্যে ঘোষাল মহাশয়ের লণ্ঠনটা হইতে নিজের লণ্ঠনে অগ্নি-সংক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এইরূপে নিজের লণ্ঠনটা জ্বালাইয়া চাটুয্যো মহাশয় ঘোষাল মহাশয়ের বৈঠকখানা হইতে পথে পদার্পণ করিলেন । ঘোষাল মহাশয় ও—‘কালকে আবার এস হে চাটুয্যো’ বলিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন ।

ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীটা গ্রামের এক প্রান্তে । ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ী হইতে নিজের বাড়ী যাইতে হইলে চাটুয্যো মশায়কে সাত আট মিনিট ঠিক পশ্চিম মুখে হাঁটিতে হইবে—এই পথটুকু বড় ফাঁকা; বামে ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীর পরই ঝোঁপ-ঝাঁপ, পতিত-ভিটা এবং দক্ষিণে ক্ষীরালি নদী পর্য্যন্ত দূর প্রসারী প্রান্তর; ইহার খানিকটা ধানক্ষেত, খানিকটা বা অ-কৃষ্ট অন্তর্কর প্রান্তর,—এই প্রান্তরের শেষে ঠিক ক্ষীরালি নদীর উপরেই কুঠী । এই পথটা চলিতে চাটুয্যো মশায়ের বরাবরই কেমন ভয় ভয় করে । ঘোষালের বাড়ী হইতে

বাহির হইয়া সাত আট মিনিট পরে চাষা-পাড়ার প্রান্তে আসিয়া পথ ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে দক্ষিণ দিকে যাইতে হয়। তাই এখানে আসিয়া তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, এবার পথের দুধারেই বাড়ী, টু শব্দ করিলেই পাশের বাড়ীগুলি হইতে চাষারা সাড়া দিবে—সব চেয়ে স্বস্তির কথা,—দৃষ্টি অবরোধকারী সারি সারি ঘরগুলির মধ্য দিয়া ঐ শূণ্য প্রান্তর আর চোখে দেখিতে হয় না। চাষা-পাড়া যেখানে শেষ হইয়াছে সেখান হইতে একটা মোড় ফিরিলেই চাটুযো মশায়ের বাড়ী।

ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চাটুযো মশায় পারতপক্ষে কোন দিকে চাহেন না—উত্তর দিকে ত নয়ই। সে দিনও কোন দিকে না তাকাইয়া সোজা চলিতেছেন, হঠাৎ এক সময় তাঁহার মনে হইল প্রান্তরের একপ্রান্তে ক্ষীরালির কুঠীতে যেন আলো জলিতেছে। চাটুযো মহাশয়ের হৃৎ-পিণ্ডটা যেন ধব্ধু করিয়া উঠিল—ক্ষীরালির ঐ কুঠী যে প্রেতাঙ্গার লীলা-ক্ষেত্র ইহা কে না জানে? চাটুযো মশায় পৈতাটা জোরে চাপিয়া ধরিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিলেন এবং ঘন ঘন শ্রীরামের নাম জপ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন—দাবা খেলিতে আসিয়া পৈত্রিক প্রাণটাই কোন দিন হারাইতে হইবে। সকল কষ্টেরই অবসান আছে, শীঘ্রই চাটুযো মশায় চাষাপাড়ার প্রান্তে আসিয়া পড়িলেন—, পৈতাটা আবার যথারীতি কটি পার্শ্বে প্রলম্বিত হইল, দশরথ-নন্দনের নামও দ্রুত উচ্চারণের বিড়ম্বনা হইতে অব্যাহতি পাইল—শুধু তাঁহার বুকের টিপ্ টিপ্ শব্দটা কগিল না। চাটুযো মহাশয় মনে ততক্ষণে একটু সাহস সঞ্চয় করিয়াছেন,—চাষাপাড়ার কাহাকেও আর ডাকিলেন না—একেবারে নিজের ঘরের দরজা আসিয়া ঘা দিলেন।

চাটুযো মশায়ের পরিবারের মধ্যে তিনি নিজে এবং তাঁর স্ত্রী; একমাত্র সন্তান কন্যাটি স্বস্তর কণ্ঠেই থাকে, পূজা-পার্বণে বাপের

বসে। প্রত্যহ রাতে চাটুযো মহাশয় দরজায় ঘা দিতেই মত্ত-নিদ্রোস্থিত। চাটুযো গৃহিণী দরজা খুলিয়া দিয়া আবার গুইয়া পড়েন—এবং চাটুযো মশায় এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ধূমপান করিয়া শয্যা গ্রহণ করেন,—এই চিরন্তন রীতি। আহারের ব্যাপারটা শেষ করিয়াই অবশ্য তিনি খেলিতে যান। সে দিনও দরজায় ঘা দিতেই নিতাকার মত চাটুযো গৃহিণী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া আবার শয্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। চাটুযো মহাশয় দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিন্তু তামাক খাইবার কোন উদ্যোগ না করিয়া শুধু মাত্র পা-দুইয়াই শয্যা গ্রহণ করিলেন। কুঠীর আলো তাঁহার তামাক খাইবার স্পৃহা নির্বাপিত ও মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। লেপ-মুড়ি দিয়া চিন্তা করিবার স্বপ্নোগ কিংবা তিনি পাইলেন না—তৎপূর্বেই তাহার মিত্রাকর্ষণ হইল।

চাটুযো মশায় ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইবার ঘণ্টাখানেক পরে গ্রামের চৌকিদার কুঞ্জ বাগদী সেই পথে ‘হাক’ দিতে আসিল। ঘোষালের বাড়ী ছাড়াইয়া কিছুদূর যাইতেই তাহার মনে হইল, ক্ষীরালির দ্বারে রেশম-কুঠীতে আলো জলিতেছে। কুঞ্জর বয়স ৩২ বৎসর হইল, চৌকিদারী চাকুরী ও করিতেছে আজ দশ বছর—কিন্তু কুঠীতে আলো জলিতে সে কোন দিন দেখে নাই। ক্ষীরালির কুঠী নানারূপ অপদেবতায় পূর্ণ বলিয়া শোনা যায়—ওই কুঠীতে বহু-বহুদিন আগে নাকি এক সাহেব খুন হইয়াছিল, জোংরা রাতে কুঠীর হাতার মধ্যে পাতলুনের পকেটে হাত পুরিয়া সাহেবের প্রেতাঙ্ককে বেড়াইতে নাকি কত পথিকই দেখিয়াছে! কুঞ্জর ধারণা হইল কুঠীর আলোটা ভৌতিক। এটা চিন্তা করিবামাত্র ভয়ে তাহার গায়ের লোম খাড়া হইয়া উঠিল। ঘোষালের বাড়ীর পেছন দিক দিয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথ সোজা বাগদী পাড়ার দিকে গিয়াছে। কুঞ্জ

চাষা পাড়ার পথ ছাড়িয়া সেই পথ ধরিল কারণ চৌকীদারী চাকুরী যাইলে অল্প কাজ পাওয়া যাইবে—কিন্তু পৈত্রিক প্রাণটা যাইলে ত আর সেটা ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। পথে চলিতে চলিতে কুঞ্জ ঠিক করিল—রাত-বিরাতে টহল দেওয়া এ বকুমারি চাকুরী সে আর করিবে না। মাসে ছয়টাকা মাহিনা—ঝড়-বাদল, সাপের ও ভূত-প্রেতের ভয় সবই মাথায় রাখিয়া কাজ করিতে হয়, তারপর আবার মাথার উপর একাধিক মালিকের হুমকি—একদিকে ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীবাবু, অপর দিকে থানার বড় দারোগা ছোট দারোগা প্রভৃতি; একটা মানুষ কতই বা আর সহ্য করিতে পারে ?

কুঞ্জ যখন তাহার ঘরের দরজায় আসিয়া ধাক্কা দিল তখন তাহার স্ত্রী টগরের চোখ ঘুমে ভরিয়া আসিতেছে। অসময়ে ঘুমে বাধা পাওয়ায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কুঞ্জ এত সকাল সকাল কোন দিন ফিরেনা। সে জিজ্ঞাসা করিল—‘কিগো, আজ এত শীঘ্র ফিরে এলে, এরই মধ্যে ‘বণ’ দেওয়া হয়ে গেল?’ কুঞ্জ যে ভয় পাইয়া পালাইয়া আসিয়াছে একথা স্ত্রীর কাছে বলিতে তাহার পৌক্কেষে বাধিল। তাহার মনে হইল স্ত্রীলোকের এত কৌতূহল ভাল নহে, সে ধমকাইয়া বলিল—‘আমি শীঘ্র ফিরি আর যাই করি তোমার কি? তুই কি সেক্রেটারি বাবু না থানার দারোগা—যে তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে?’ টগর কুঞ্জর স্বভাব জানিত, একটা কারণ অনুমান করিয়া সে শুইয়া পড়িল, তাহার তিরস্কারের কোন উত্তর দিল না। কুঞ্জ একটু রাগী হইলেও আসলে মানুষ মন্দ নয়—তাহাকে খুব ভালবাসে। নীল জামা, কোমরবন্ধ ও লাঠীটা যথাস্থানে রাখিয়া কুঞ্জ ও বিছানায় শুইয়া পড়িল। শুইয়া সে তাহার অগ্গকার অভিজ্ঞতার কথা ভাবিতে লাগিল। একবার ভাবিল :—টগরকে জাগাইয়া সব কথা বলে,

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল একজন তুচ্ছ স্ত্রীলোককে তাহার দুর্বলতার কথা জানান তাহার মর্যাদার পক্ষে হানি কর হইবে।

(২)

বনতুলসী গ্রাম আর ক্ষীরালি নদীর মধ্যে যে বিস্তৃত প্রান্তর পড়িয়া আছে, উহা এতদঞ্চলের লোকের কাছে রনডাঙ্গা বলিয়া পরিচিত। বগী—হাঙ্গামার সময় এই প্রান্তরে নবাবের সৈন্যদলের সঙ্গে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে মারাঠা-দস্যাদের একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। বন-তুলসী গ্রামের পত্তন হইলে এই বিশাল প্রান্তরের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থান গুলি কাটিয়া ধাত্তক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। জমি চষিবার সময় ফালের মুখে এখনও এই যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ মড়ার খুলি হাড় প্রভৃতি পাওয়া যায়।

ক্ষীরালি নদী পর্য্যন্ত এই প্রান্তরের বিস্তৃতি। প্রান্তর যেখানে শেষ হইয়াছে অর্থাৎ ক্ষীরালির ঠিক তীরেই একটা কুঠীর ভগ্নাবশেষ গ্রাম-বৃদ্ধেরা ও বরাবর দেখিয়া আসিতেছেন। দুইশত আড়াইশত বৎসর পূর্বে কুঠীর শিল্প হিসাবে এখানে রেশমের খুব চলন ছিল। মুসলমান নবাবের নিকট হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাংলার শাসন ভার গ্রহণ করেন তখন এক ইংরেজ কোম্পানীর দৃষ্টি পড়ে এতদঞ্চলের রেশম ব্যবসায়ের উপর। বাংলার নানাস্থানে এই কোম্পানীর নানারূপ ব্যবসায় ছিল। ক্ষীরালি নদীর ধারে দুই তিন বিঘা জায়গা ক্রয় করিয়া কোম্পানী এখানে রেশমকুঠীর পত্তন করিলেন। সমস্ত জায়গাটা প্রাচীর দিয়া ঘেরা হইল, নদীর ধারে কুঠীর খিলান করা ঘর, চিম্নী, চুল্লী প্রভৃতি তৈয়ারী কিছুই বাকী রহিল না। কুঠীর একপ্রান্তে এখন যে দিকে বনতুলসী গ্রাম সেই দিকে মুখ করিয়া

কুঠীয়াল সাহেবের জন্ম বাংলাে নির্মিত হইল। কুঠীর নির্মাণ কাৰ্য্য শেষ হইলে কোম্পানীর একজন সাহেব কুঠীর ভার লইয়া আসিলেন। ১৫২০ বৎসর কুঠীর কাজ চলিল বেশ ভাল ভাবেই। কুড়ি বৎসর কুঠী চলার পর একজন নূতন সাহেব কুঠীর ভার লইয়া আসিলেন। সাহেবের চরিত্র ভাল ছিল না, তার উপর তিনি ছিলেন অত্যন্ত মাতাল। ক্ষীরালির উত্তর তীরে যে সাঁওতাল পল্লী এখনও রহিয়াছে—উহা তখন ও ছিল। এই সাঁওতাল পল্লীর স্বামী—পুরুষরাই ছিল কুঠীর প্রধান শ্রমিক। কুঠীয়াল সাহেব একবার মাতাল অবস্থায় নাকি কোন এক সাঁওতাল রমণীর প্রতি অত্যাচার করেন। তারপর দিন সকাল বেলা বাংলোর বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে—সাহেব খবরের কাগজ পড়িতেছেন—এমন সময় একটা বিষাক্ত তীর তাঁহার গলা ভেদ করিয়া ফেলে, তীরের তীক্ষ্ণতা ও বিষের তীব্রতায় সাহেব তৎক্ষণাৎ মারা যান। কুঠীর পূর্বে দক্ষিণ-কোণে এখনও এই হতভাগা সাহেবের সমাধি রহিয়াছে।

সাহেবের মৃত্যুর পর শোনা গিয়াছিল—কলিকাতার আপিস হইতে আর একজন সাহেব কুঠীর ভার লইয়া আসিতেছেন—কিন্তু কাৰ্য্যতঃ তাহা আর হইয়া উঠে নাই। ইউরোপে রেশমের চাহিদা হঠাৎ কমিয়া যাওয়ায় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট রেশম বিক্রীর “কন্ট্রাক্ট” শেষ হইয়া যাওয়ায় কোম্পানী কুঠীর কাজ বন্ধ করিয়া দেন। এই সাহেব কোম্পানী কুঠী তুলিয়া দিলে—একজন উৎসাহী বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এই কুঠী কিনিয়া লন। কুঠী চালানো তাঁহার পক্ষেও সম্ভব না হওয়ায় সাদৃশ্যত বৎসর ধরিয়া ক্ষীরালির কুঠী ‘বনতুলসী’ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকদের ইতিহাসের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। কুঠীতে খুনের জন্ম জনসাধারণের মনে কুঠী সম্বন্ধে ভয়ও কম নয়। বনতুলসী হইতে কেঁয়াফুলির থানায় অথবা জেলার সদরে যাইবার রাস্তা হইতেছে

ঠিক কুঠীর পাশ দিয়া। সহরে অথবা থানায় একা যাইতে হইলে সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করে দিনের আলো থাকিতে কুঠী পার হইবার। অন্ধকার রাত্রে কুঠীর পাশ দিয়া অল্প লোকই হাঁটিয়াছে; তবুও বহুলোক বন্ধুবান্ধবের নিকট গল্প করে—“সে দিন যখন রাত্রিবেলা একাই সহরথেকে কুঠীর পাশ দিই আসছিলাম—দেখলাম কুঠীর হাতার মধ্যে একজন সাহেব এক মেমের হাত ধরে পায়েচারি করছে; আমি কিছু ভয় পাই নি, বললাম—কে? অমনি আর কোথাও কেউ নাই, ‘দীন তারিণী তারা’ গানটা গাইতে গাইতে দিবা বাড়ী চলে এলাম।” বীরপুঙ্খবদের এই অশরীরী দর্শন কাহিনী শুনিয়া সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের শরীরও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইত না।

(৩)

এহেন কুঠীতে যেখানে প্রায় দেড়শত বর্ষ ধরিয়া মাতৃমের পদক্ষেপ পড়ে নাই সেখানে রাত্রিবেলা আলো জ্বলিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভবতারণ চাটুষ্যে অথবা নিরক্ষর কুঞ্জ বাগদীর যে হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি !

সকাল বেলায় ভবতারণ চাটুষ্যে মহাশয় অথবা কুঞ্জ কেহই তাহাদের নৈশ অভিজ্ঞতার কথা প্রচার করিবার পূর্বেই বনতুলসী গ্রামে প্রচার হইয়া গেল ক্ষীরালির রেশম কুঠীতে একজন বাবু আসিয়াছেন। বদন মণ্ডলের জামায়ের বাড়ী ক্ষীরালির ওপারের একটা গ্রামে। বদন মেয়েকে দেখিবার জন্ত জামাই বাড়ী গিয়াছিল। ভোর রাত্রে সেখান হইতে গ্রামে ফিরিবার পথে সে রেশম কুঠীর একপ্রান্তে এক ৩৬।৩৭ বৎসরের বাবুকে পায়েচারি করিতে দেখিয়া আসিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া ভবতারণ চাটুষ্যে নিশ্চিত হইলেন, তাঁহার মনে হইল—যাক্

গতরাত্রির আলোটা তাহা হইলে ভৌতিক নয়; আর এবার যতরাংই দাবা খেলিয়া বাড়ী ফেরা যাউক না কেন—কুঠীটার দিকে তাকাইলে আর বুক দুর্ দুর্ করিरेনা, কারণ বদনের বর্ণনা ঠিক হইলে লোকটা স্থায়ী ভাবে বাস করিবে বলিয়াই মনে হয়।

কুঞ্জ সংবাদটা শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইল না, কুঠীর আগন্তকের প্রতি তাহার মন বিষাক্ত হইয়া রহিল। হতভাগা লোকটার জন্ম কাল বিছানায় বহুক্ষণ তাহার হৃৎকম্প থামে নাই। সেই দিনই কুঞ্জর থানায় হাজিরা দেওয়ার দিন। সাজসজ্জা পরিয়া কুঠীর পাশ দিয়া যাইবার সময় সে রাস্তায় চলিতে চলিতে যতটা সম্ভব লোকটিকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। কেঁয়াফুলি থানার অনতিদূরে একজন নজরবন্দী বাস করে, কুঞ্জর কেমন যেন মনে হইল—এই লোকটিও উহার সমগোত্রীয়ই হইবে। কিছুক্ষণ পরেই তাহার মনে হইল—ইহা একপ্রকার অসম্ভব, বনতুলসী গ্রামের এলাকায় কোন রাজবন্দীর থাকার কথা হইলে কুঞ্জরই সর্বাগ্রে ইহা জানিবার কথা,—কৈ সে-ত এরূপ কোন কথা শুনে নাই।

থানায় পৌঁছিয়া কুঞ্জ প্রথমেই থানার বড়দারোগো সর্কেশ্বর গাঙ্গুলীকে খবরটা দিল। কুঞ্জর বিবরণ শুনিয়া তাঁহারও মনে হইল লোকটা কে? তাঁহার এলাকায় তাঁহার অজানিত ভাবে সরকার কোন ডেটিম্যু রাখিতে পারেনা। লোকটাকে একবার দেখিয়া লইবার উদ্দেশ্যে গাঙ্গুলী মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রিয় বাহন একটি ঘোটকীতে আরোহণ করিয়া বনতুলসী অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

বনতুলসী গ্রামে গাঙ্গুলী মহাশয়ের খুব যাতায়াত আছে, এ অঞ্চলের মধ্যে ওই গ্রামেরই দুচারজন ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বও জন্মিয়াছে বনতুলসীর রামময় ঘোষালের দাবার আড্ডায় মধ্যে মধ্যে খেলিয়া না আসিলে গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাজে মনই বসেনা। নদী পার হইয়া কুঠীর কাছটা গাঙ্গুলী মহাশয় ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া হাঁটিয়াই

চলিতে লাগিলেন। পথের নিকটেই ‘সাহেবের দালান’; গাঙ্গুলী মহাশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইলেন—দালানের বারান্দায় ৩৬।৩৭ বৎসরের গৌরবর্ণ একভদ্রলোক খালি গায়ে পায়চারি করিতেছেন। গাঙ্গুলী মহাশয় কুঠী পার হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বনতুলসীর দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও তিনি ভাবিলেন যখন এখানে আসিয়াছেন—তখন একবার বনতুলসী না চুকিয়া ফেরা উচিত হইবে না। চাটুয্যে মহাশয়—ঘোষাল মহাশয় প্রভৃতির তবুটাও লওয়া দরকার। চাকরী না হয় করিতেছেন, তাই বলিয়া সামাজিক কর্তব্য গুলি কি পালন করিতে হইবেনা?

ঘণ্টাখানেক পরে সর্বোৎকর্ষ গাঙ্গুলী আবার সেই পথ দিয়া থানায় ফিরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুঠীর আগন্তুক লোকটার চেহারার আত্মপুঙ্খিক বিবরণ সদরে লিখিয়া পাঠাইয়া জানিতে চাহিলেন—লোকটা সন্দেহ ভাজন কি না? দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় গাঙ্গুলী মহাশয়ের জানিতে বাকী ছিল না—কোন সন্দেহভাজন লোক আসিলে সদর হইতে আগেই তাঁহাকে জানান হইত তবুও বলা যায় না—সদর আপিসের ভুলও ত হইতে পারে। লোকটা ফেরারী আসামী হইলে অযাচিতভাবে সন্ধান দেওয়ার জন্ত তাঁহার ত পদোন্নতি হইতেও পারে—এই সব নানা চিন্তায় তিনি সদরে পত্র লিখিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই সদর হইতে কেঁয়াফুলি থানায় খবর আসিল—বর্ণিত চেহারার কোন ফেরারী আসামী নাই, আর ডেটিং হইলে ত থানাতে আগেই জানান হইত। তবে লোকটার উপর অল্প নজর রাখার জন্ত আদেশ সদর হইতে আসিল। সর্বোৎকর্ষ গাঙ্গুলীর মন হইতে—কিন্তু চিন্তা দূর হইল না; লোকালয় হইতে দূরে একটা ভাঙ্গা কুঠীর মধ্যে লোকটা কি স্থখে জীবন যাপন করিতে আসিয়াছে। গাঙ্গুলী মহাশয় এক সময়ে নভেল পড়িতে বড় ভালবাসিতেন।

দামোদর মুখোপাধ্যায় এর গ্রন্থাবলী, পাঁচকড়িদের ডিটেকটিভ উপন্যাস এক সময়ে তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। বন্ধিম বাবুর বিষবৃক্ষ প্রভাত বাবুর ‘সিন্দুর কোঁটা’ প্রভৃতি বই তিনি পড়িয়াছিলেন। সংসারের চাপে আজকাল আর বড় একটা পড়া হয় না। গাঙ্গুলী মহাশয়ের এক সময় মনে হইল—‘সামে বাদ’ কি ‘প্রেমের দায়’ ঐ রকম নামের একটা বইয়ে তিনি যেন পড়িয়াছিলেন—নিহুঁরা নাগিকাব প্রত্যাখ্যান সহ করিতে না পারিয়া ভগ্ন-হৃদয় নায়ক সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কি জানি কেন—তাঁহার মনে হইল কুঠীর ভদ্রলোকটির সহিত প্রেম-ঘটিত কোন ব্যাপার জড়িত আছে। মনে যে সিদ্ধান্ত একবার জাগিলে তাহাকে আঁকড়াইয়া থাকা ‘দু’একজন লোকের স্বভাব। গাঙ্গুলী মহাশয় ও এই প্রকৃতির লোক। লোকটি যখন ‘রাজবন্দী’ অথবা ফেরারী আসামী নহে তখন সে নিশ্চয়ই হতাশ-প্রেমিক—বহু চিন্তার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। নিজের বুদ্ধির উপর তাঁহার অত্যন্ত আস্থা ছিল। লোকের নিকট প্রায়ই গল্প করিয়া বলিতেন—“হঁ, হঁ বাবা, বুদ্ধি না থাকলে কি আর ক’নেষ্টবল থেকে থানা—ইন—চার্জ হতে পারি?”

(৪)

কুঠীর ভদ্রলোকটিকে লইয়া বনতুলসীতে ও কম চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় নাই। প্রথমে সকলেই ভাবিয়াছিল—লোকটি রাজবন্দী। সর্ব্বোপরি গাঙ্গুলী বনতুলসীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত। তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিয়া সে যে রাজবন্দী নয় এ খবর জানিতে কাহারও বাকী রহিল না। তখনও বড় দিনের ছুটি। কলিকাতা প্রবাসী কয়জন স্থল-কলেজের ছাত্র ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছিল—এই সংবাদে

তাহারা ঠোঁট ঝাঁকুইয়া কহিল—‘লোকটা স্পাই, আমরা কলকাতার পাণ্ডা-ছাত্র কিনা তাই আমাদের ওয়াচ্ করবার জন্তে গভর্ণমেন্ট ওকে খুব সম্ভবতঃ পাঠিয়েছে।’ দুঃখের বিষয় কলিকাতার নেতাদের কথায় কেহ কণপাত করিল না—লোকটা যদি স্পাই-ই হইবে তবে বনতুলসীতে একদিনও আসে না কেন, লোকের সাথে মেলামেশাই বা করে না কেন? ‘সাহেবের দালানটা’ বাসযোগ্য করিবার জন্ত একদিন মাত্র লোকটা কয়জন সাঁওতাল ডাকিয়া ছিল, আর রতনপুরের হাটে একদিন তাহাকে নিঃশব্দে চাল, আলু প্রভৃতি কিনিতে দেখা গিয়াছিল। মাতৃয়ের সঙ্গে এই এক মাসের মধ্যে তাহাকে আর কোন কারবার করিতে দেখা যায় নাই। ভদ্রলোকের সহিত মেলামেশা করিবার কোন চেষ্টা যে করে না, দৈবাৎ সামনে পড়িলে শুধু স্মান হাসি হাসিয়া যে চোখ ফিরাইয়া লয়—তাহাকে স্পাই বলিয়া কেহ মনে করিতে পারিল না। বনতুলসী ও ক্ষীরালির কুঠীর মধ্যে যেমন একটা দীর্ঘ ব্যবধান, বনতুলসীর মাতৃঘণ্টার সঙ্গে কুঠীর ভদ্রলোকটির মনের ব্যবধান তাহা হইতে দীর্ঘ হইয়া রহিলেও এ ব্যবধান একদিন মিলাইয়া গেল। বনতুলসীর অন্ততঃ একটা পরিবারের সহিত কুঠীর রহস্যময় ভদ্রলোকটির জীবন জড়িত হইয়া পড়িল।

বনতুলসীর মধ্যে চৌধুরী পরিবার ধনে—বিদ্যায়—বংশ মর্যাদায় সকল দিক দিয়াই বড়। এই বাড়ীর কর্তা কিরণবাবুর বয়স ৩৭।৩৮ হইবে। কিরণবাবুর পিতামহ ছিলেন অতি দরিদ্র, পরের সাহায্যে, বৃত্তিলক্ষ টাকায়, লেখাপড়া শিখিয়া শেষে তিনি ওকালতী পাশ করেন। প্রতিকূল ভাগ্যের সহিত যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে দীর্ঘকাল ভুলিয়া থাকিতে পারিলেন না। জেলা কোর্টে ওকালতী করিয়া তিনি বিস্তৃত জমিদারী ক্রয় করিলেন। পৈতৃক কুঠীর ভাদ্রিয়া স্বরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া তিনি শেষ বয়সে গ্রামেই বসবাস আরম্ভ

করিলেন। কিরণবাবুর পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র জগদীশ বাবু এই সম্পত্তির মালিক হইলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্বে তিনি মুন্সেফী চাকুরী করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর আর চাকুরী করার প্রয়োজন হইল না। চাকুরী ছাড়িয়া তিনি জমিদারীর প্রতি মনোযোগী হইলেন। গ্রামের ‘জনার্দন এম-ই স্কুল’টি ইনিই তাঁহার পিতার নামে স্থাপিত করেন। জগদীশবাবু যখন মাঝা যান কিরণবাবু তখন “এম-এ” পাশ করিয়া “ল” পড়িতেছেন। পিতার মৃত্যুর পর জমিদারীর কার্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে “ল” পড়া ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়া বসিতে হয়। কিরণবাবু স্ববিদ্বান্ লোক—গ্রন্থ ক্রয়, পাঠ ও গ্রন্থ-সংগ্রহ তাঁহার জীবনের প্রধান আকর্ষণ। তাঁর আর একটি বিলাস আছে উহা তাঁহার বাগান। বাটীর দক্ষিণে বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি একটা স্বরম্য উপবন নির্মাণ করিয়াছেন। দেশীয় ও বিদেশীয় নানা বৃক্ষলতায় বাগানটি পূর্ণ। বাগানের মধ্যে স্বচ্ছ জলাশয়, নানারূপ মন্দির মূর্তি—বৃক্ষমূলে প্রস্তুত বেদিকা কিছুরই অভাব নাই—এটাকে মনোমত করিতে কিরণবাবু বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

কিরণ বাবুরও একটা মাত্র পুত্র নাম অশোক কুমার। অশোকের বয়স ২১০ বৎসর। গৌরবর্ণ, উজ্জল চক্ষু, স্ত্রী. বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান্ ছেলেটি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামের মাইনর স্কুলের সেকেণ্ডার্সে সে পড়ে।

(৫)

সে দিন ছিল শনিবার। স্কুলের ছুটির পর অশোক বাড়ীতে বইখাতা রাখিয়া সেই দুপুরেই বেড়াইতে বাহির হইল। বাল্যকালে কিরণবাবু যাহাকে বলে ‘কুনো’ প্রকৃতির, তাহাই ছিলেন, এজন্য

তাঁহার স্বাস্থ্য বড় ভাল ছিল না। নিজের অভিজ্ঞতায় তাঁহার জ্ঞান হইয়াছিল বালাকালে ছোটোছুটি-লাফ-ঝাপ করিলে ছেলেদের স্বাস্থ্য ভালই থাকে, এইজন্ত তিনি ঘোরাফেরা সম্বন্ধে ছেলেকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। সেই ছুপুরে বাহির হইয়া অশোক রণভাঙ্গার মাঠের দিকে অগ্রসর হইল। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় দু'একজন সঙ্গী লইয়া বেড়াইতে যাইবার কথা তাহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু কি জানি কেন হেমন্তের অলস মধ্যাহ্নের নির্জনতা তাহার বেশ ভাল লাগিয়া গেল—সঙ্গী ডাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে অশোক দেখিল সে কুঠীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছে।

কুঠীর কম্পাউণ্ডের ধারেই একটা বনকুলের গাছ, গাছটা পাকা কুলে পরিপূর্ণ। অশোক কুল খাইবার উদ্দেশ্যে গাছে উঠিয়া পড়িল—এসব বিষয়ে সে স্বদক্ষ। অশোক কুল গাছে উঠিয়া পড়িয়াছে—এমন সময় নদীর দিক হইতে তাহাকে দেখিয়া একটা বড় সাঁওতালদের কুকুর ছুটিয়া আগিল। অশোক ততক্ষণ গাছে উঠিয়া পড়িয়াছে—কুকুরটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া চীংকার করিতে লাগিল। কুল গাছটা কুঠীর জানলা হইতে বেশ দেখা যায়। কুকুরের চীংকারে কুঠীর ভদ্রলোকটা আকৃষ্ট হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। কুকুরটার ভয়ে ছেলেটা গাছ হইতে নামিতে পারিতেছে না দেখিয়া তিনি আসিয়া লাঠী লইয়া কুকুরটাকে তাড়াইয়া দিলেন। অশোক ও হাসিতে হাসিতে গাছ হইতে নামিয়া আসিল, তাহার দুই পকেট তখন পাকা কুলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই স্বদর্শন বালকটিকে দেখিয়া ভদ্রলোকের বড়ই ভাল লাগিল। এই ছুপুরে একলা ঘুরিয়া বেড়ানোর জন্ত মুছ তিরস্কার করিয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—‘খোকা, কি নাম তোমার? কোথায় বাড়ী তোমাদের?’

অশোক হাসিয়া বলিল—‘আমার নাম অশোক, আর ওই খে বনতুলসীতে হল্দের রঙ্গের দোতালা বাড়ী দেখছেন ওইটা আমাদের বাড়ী। আমার বাবার নাম শোনের নি ? তাঁর নাম শ্রীযুক্ত বাবু কিরণ কুমার চৌধুরী।’ ছেলেটির সপ্রতিভ কথাবার্তায় ভদ্রলোক বড়ই প্রীত হইলেন। তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—‘এস খোকা, রোদে বড় ক্লান্ত হয়েছ, আমার ঘরে একটু বসবে-এস।’ কুঠীর ভিতরে অশোক কখন ও যায় নাই—কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে সে ভদ্রলোকের সঙ্গে চলিল। কম্পাউণ্ড পার হইয়াই একটা দালান। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একটু বারান্দা, তাহার দুধারে দুখানা ঘর—ইহার মাঝে একটা বড় হল ঘর। হল ঘরের ওধারে উত্তর দিকে আর একটা বারান্দা—এখানে দাঁড়াইলে একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে আসল রেশম কুঠীর ধ্বংসাবশেষ—কতকগুলি খিলানকরা ভাঙ্গাঘর—ভাঙ্গাচুল্লী, চিমনি প্রভৃতি দেখা যায়। দক্ষিণ দিক হইতে কম্পাউণ্ড পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বাঁ দিকে যে ঘরখানি পড়ে—অশোককে লইয়া ভদ্রলোক সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন—এইটাই তাঁর বাস-কক্ষ। ঘরের দক্ষিণদিকের জানালা দিয়া বনতুলসী এমন কি অশোকদের হল্দের রঙ্গের দোতালা বাড়ীটাও দেখা যায়। পূর্ব দিকের জানালাটা দিয়া ক্ষীরালি নদীর ধূ—ধূ—বালুকা রাশির মধ্যে—ক্ষীণ জলরেখা দেখা যায়। ভদ্রলোক অশোককে খাটের উপর বসিতে দিলেন। তার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কি পড়ে, তাহারা ক’ ভাই বোন ইত্যাদি। অশোক বলিল সে মাইনের স্কুলের সেকেণ্ডগ্রাসে পড়ে, তাহার আর ভাই-বোন নাই। এই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে অশোকের ও বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষদের মতই কৌতূহল ছিল। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—“আচ্ছা—আপনি কি নজরবন্দী ?”

ভদ্রলোকটি বুঝিলেন তাহার এই নির্জন বাসই লোকের মনে

ঊঁহার সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে। বালকের সরলতায় তাঁহার মনে বেশ আনন্দও জন্মিল তিনি বলিলেন—“কে বল্লে থোকা, আমি নজর বন্দী। আমি ত নজর বন্দী নই।”

অশোক একটু লজ্জিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল “আচ্ছা এখানে একা থাকতে আপনার ভয় করে না?”

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—“ভয় কেন কর্বে থোকা? তোমার কি বাড়ীতে ভয় করে?”

অশোক উত্তর দিল—“না বাড়ীতে ভয় কর্বে কেন? আমি যে মায়ের কাছে শুয়ে থাকি।”

ভদ্রলোক বলিলেন—“তুমি যেমন তোমার মায়ের কাছে শুয়ে নিশ্চিন্ত থাক—আমি ও তেমনি সর্বদাই ঈশ্বরের কাছে আছি। বলে নির্ভয়ে থাকি।”—কথাটা অশোক বুঝিল না, ঈশ্বর ত আর মানুষ নন, মেঘের আড়ালে তিনি বাস করেন,—ইনি তাঁহার কাছে থাকেন বলিলেন কেমন করিয়া। অশোক এবার উঠিতে চাহিল। ভদ্রলোক তাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আবার আসিতে বলিলেন—ছেলেটাকে দেখিয়া কত পুরাতন স্মৃতি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। অশোককে তিনি অনেক দূর আগাইয়া দিলেন। হঠাৎ অশোক তাঁহার কাছে আবার ছুটিয়া আসিল, বলিল, ‘আচ্ছা আপনাকে কি বলে ডাকব।’ ভদ্রলোক কি যেন ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—‘এককালে সবাই বলতো মাষ্টার মশায়, তুমিও তাই বলো বাবা।’ অশোক সন্তুষ্ট হইয়া গ্রামের পথ ধরিল। ‘মাষ্টার মশায়’ ও নিজের ঘরে আসিয়া বসিলেন। তখনও জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল—অশোক রণভাস্কর মাঠ পার হইতেছে। অশোক চোখের আড়ালে গেলে মাষ্টার মহাশয়ের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—পাঁচ বছর আগে যাহাদের হারাইয়াছেন তাহাদের স্মৃতি তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল। মন

চঞ্চল হইবামাত্র বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া তিনি পূজার ঘরে প্রবেশ করিলেন—বারান্দার অপর প্রান্তের ঘরটা তাঁহার পূজার ঘর, সাংসারিক জালা-যন্ত্রণার মুক্তি তিনি এই ঘরের মধ্যেই খুঁজিয়া পান। শাস্তিতে ভজন-সাধন করিবার জগ্গই তিনি বাঙ্গালাদেশের এক প্রান্তে নির্জন জীর্ণ কুঠীতে বাসা বাঁধিয়াছেন।

(৬)

পরের দিন রবিবার,—সকালে উঠিয়াই মাষ্টার মহাশয়ের কি জানি কেন মনে হইল—আজ আবার অশোক আসিবে। কুঠীর মধ্যে একটা বেশ ভাল পেয়ারার গাছ আছে। কুঠীর দিকে লোকজনের আনাগোনা কম থাকায় গাছটা ফলে ভরিয়া থাকিত। মাষ্টার মহাশয় গাছে উঠিয়া সুপুষ্ট কতকগুলি পেয়ারা পাড়িয়া রাখিলেন—অশোক আসিলে উহাকে দিতে হইবে। দুপুরের দিকে অশোক আসিল। দূর হইতে তাহাকে আসিতে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় তাহার দিকে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া নিজের ঘরে লইয়া আসিলেন। অশোক প্রথমেই বলিল—“মাষ্টার মহাশয়, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে বাবা কাল আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আস্তে চান।” অশোকের মুখে কুঠীর ভদ্রলোকের তাঁহার ছেলের প্রতি স্নেহ-পূর্ণ কোমল ব্যবহারের কথা শুনিয়া কিরণবাবুর মনে হয়—ভদ্রলোককে একবার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ভদ্রলোকের ঘরে অনেকগুলি বই আছে শুনিয়া কিরণবাবুর মনে হইয়াছিল—এখনি ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিয়া আসেন। কিন্তু যে লোক এ পর্যন্ত কোন লোকের সহিত আলাপ করে নাই—তাহার সহিত এমনই ত আর দেখা করা চলে না, তাই কিরণবাবু অশোককে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে

বলিয়াছিলেন। অশোকের কথা শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, “তোমার বাবা কষ্ট করে আস্তে চেয়েছেন, তিনি এলে আমি খুসীই হ’ব, আমারই উচিত ছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করা।” অশোকের সঙ্গে তাহাদের পরিবার, তাহার লেখা-পড়া, তাহাদের গ্রাম সম্বন্ধে মাষ্টার মহাশয়ের বহু আলাপ হইল। এবার অশোক বলিল, “আমাকে একটা ভাল গল্প বলুন।” মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, “তুমি রামায়ণ-মহাভারত পড়েছ খোকা?” অশোক বলিল রামায়ণ সে পড়িয়াছে, কিন্তু মহাভারত এখনও পড়ে নাই। মহাভারতের একটা গল্প শুনিবার জন্ত অশোক ঝোঁক ধরিল। ভদ্রলোক শিশুর সাহচর্য্য হইতে বহুদিন বঞ্চিত। অশোকের আগ্রহ দেখিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন, —নিষাদ রাজার ছেলে একলব্য গুরু দ্রোণের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট আসিল অস্ত্র শিক্ষা করিতে। কৌরব বংশের রাজকুমারদের গুরু দ্রোণ। তিনি কি অস্পৃশ্য একলব্যকে শিষ্য করিতে পারেন! তিনি একলব্যকে দিলেন তাড়াইয়া। মনের দুঃখে একলব্য বনে চলিয়া গেল। সেখানে গুরু দ্রোণের প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া সে একমনে অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিল, এবং শীঘ্রই দণ্ডবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিল। পাণ্ডবেরা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন সঙ্গে গুরু দ্রোণ। সহসা তাঁহারা দেখিলেন বনের দিক হইতে তাঁহাদের একটা শিকারী কুকুর আসিতেছে—তাহার মুখ তীরবিদ্ধ, তাহার আর চীৎকার করিবার সামর্থ্য নাই। দ্রোণের প্রিয় শিষ্য অর্জুন এই অপূর্ব্ব শরসন্ধান খুব ক্ষুব্ধ হইলেন—এমন কৌশল ত গুরু তাঁহাকে শিখান নাই! বনে প্রবেশ করিয়া অর্জুন জানিলেন, শর-সন্ধানকারী একলব্য আপনাকে গুরু দ্রোণের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে। তাঁহার প্রিয় শিষ্যদের অস্ত্রকৌশলে হারাইয়া দিবে সামান্য একজন চণ্ডাল-বালক! গুরু দ্রোণের ইহা সহ্য হইল না। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন,

“আমাকে যদি গুরু বলিয়া মান, তবে আমাকে তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলি গুরু-দক্ষিণা দাও।” একলব্য তৎক্ষণাৎ তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটিয়া দিল। রাজকুমারদের সঙ্গে গুরু দ্রোণ রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।— শুনিতে শুনিতে একলব্যের প্রতি সমবেদনায় অশোকের মন ভরিয়া উঠিল। নীচবংশে জন্ম বলিয়া একলব্যকে গুরু দ্রোণ তাড়াইয়া দিলেন! নিজের সাধনায় সে যেটুকু শিখিল গুরু দ্রোণ গুরুদক্ষিণার ছলে তাহা হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিলেন! কে বলে দ্রোণাচার্য্য বীর! কে বলে অর্জুন বীর! এই ঈর্ষাক্ত, সঙ্কীর্ণ মন যাহাদের তাহাদিগকে মানুষ পূজা করে কি বলিয়া! গল্প শেষ হইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া অশোক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেই সময়ে মাষ্টার মহাশয় পেছন দিক হইতে অশোকের প্যাণ্টের পকেটে পেয়ারাগুলি পুরিয়া দিলেন। একলব্যের কাহিনী শুনিয়া তাহার মুখে যে গাভীর্ঘ্য দেখা দিয়াছিল স্বপক্ষ পেয়ারা পাইয়া তাহার সেভাব কাটিয়া গেল। বেলা পড়িয়া আসিতেছিল,—অশোক বাড়ী যাইতে চাহিল। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে বহুদূর আগাইয়া দিয়া আসিলেন। সমস্ত পথ অশোকের মনে হইতে লাগিল, মাষ্টার মহাশয় কত ভাল লোক! এই দুই দিনের আলাপেই তাহার মনে হইল, তাহার বাবা-মা ছাড়া তাহাকে আর কেহ এত ভালবাসে না।

তার পর দিন অশোকের স্কুলের ছুটির পর কিরণবাবু অশোককে লইয়া কুঠীতে আসিলেন। কিরণবাবুকে বিনীত সম্ভাষণ জানাইয়া, মাষ্টার মহাশয় অশোককে কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার মনে হইল, কিরণবাবু এখানে আসিবার পূর্বেই তাঁহার নিজেরই তাঁহার সহিত গিয়া দেখা করিলে ভাল হইত। নিরঞ্জনতার জন্ত, নিরালায় সাধনার জন্ত তিনি না হয় এইখানে বাসা বাধিয়াছেন—কিন্তু এমন একজন সদাশয় অমায়িক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়া আসিলে

কি-ই-বা .এমন দোষের হইত ! কিরণবাবুকে তিনি সাদরে খাটিয়ার উপর বসিতে দিলেন । ঘরে বিশেষ কোন আসবাব নাই, সাঁওতালী খাটিয়ার উপর কবল পাতা—এইটাই তাঁহার শয্যা । কিরণবাবু বসিয়াই মুহূর্তের মধ্যে ঘরটা দেখিয়া লইলেন,—একটা আলনা, তাকের উপর রাখা অনেকগুলি বই, গেলাস দিয়া মুখ-ঢাকা একটা জলের কুঁজা, আর এই খাটিয়াটা ছাড়া এ ঘরে আর কোন জিনিস নাই । বারান্দায় ওদিকের ঘরের খোলা দরজা দিয়া আসন, ধূপাধার প্রভৃতি দেখিয়া কিরণবাবু অমুমান করিয়া লইলেন, ওটা পূজার ঘর । ঘরখানা দেখা শেষ হইতেই কিরণবাবু বলিলেন, “আপনাকে হয়ত বিরক্ত করলুম ! খোকার কাছে আপনার কথা শুনে আপনার সঙ্গে আলাপ কর্তে ছুটে এলুম—আমার অশিষ্টতা মার্জনা করবেন ।” মাষ্টার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “না না, সে কি ! আপনি এসেছেন এ ত আমারই সৌভাগ্য, আমিই আপনার সঙ্গে এতদিন দেখা করিনি বলে লজ্জা বোধ করছি ।” বই-ঘাটা কিরণবাবুর স্বভাব । ঘরে অতগুলি বই দেখিয়া কিরণবাবু তাকের নিকট উঠিয়া গেলেন । ভদ্রতা-অভদ্রতার কোন প্রশ্ন মনে না আনিয়াই তিনি বইগুলি দেখিতে লাগিলেন । ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ অনেকগুলি পুস্তক সেখানে রহিয়াছে । প্রত্যেক পুস্তকই সম্বন্ধ অধ্যয়নের চিহ্ন বহন করিতেছে । লোকালয়ের মায়া যে কাটাইতে পারিয়াছে এই শতাব্দিক পুস্তকের মায়া সে যে কাটাইতে পারে নাই, ইচ্ছা বেশ বুঝা গেল । কিরণবাবু দেখিলেন, প্রত্যেক বইয়েই প্রায় একটা নাম লেখা আছে—অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার রায় । বই দেখা শেষ হইলে কিরণবাবু আবার খাটিয়ায় আসিয়া বসিলেন । ততক্ষণে ভদ্রলোক অশোকের সহিত বেশ গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন । কিরণবাবু যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিয়া ভদ্রলোকের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিলেন ।

কথায় কথায় আসিয়া পড়িল রেশম কুঠীর ইতিহাস। এক ইংরেজ কোম্পানী এই কুঠী কোন বাঙ্গালী ব্যবসাদারের নিকট বিক্রয় করিয়া যান,—ঐ ব্যবসায়ীর বর্তমান বংশধরেরা এই কুঠীর মালিক,—তঁাহারা কোন দিন কুঠীর খোজ খবর লইয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই ; কিরণবাবু এইটুকু বলিয়া থামিলেন। তাঁহার কথার শেষে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, “আপনারা কি কুঠীর বর্তমান মালিককে চেনেন?” কিরণবাবু ‘না’ বলিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, “কুঠীর বর্তমান মালিক আশুতোষ সরকার—আমার এক পরিচিত বন্ধু। আমার শরীর ও মনের দিক্ থেকে শাস্তির বড় প্রয়োজন, এই উদ্দেশ্যে নির্জন কোন এক জায়গায় আমি বাস করতে চাই জেনে, তিনি এই কুঠীর কথা আমাকে বলেন। আমি থাকতে চাইলে স্বচ্ছন্দে এখানে বাস করতে পারি, একথা বলায়, আমি এখানে চলে আসি। অবশ্য তিনি ভূতের ভয় প্রভৃতি নানারকম কথা বলে আমাকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন। পাঁচ বছর ধরে ভারতের সর্বত্র ঘুরেছি,—কত দুর্গম ভয়াবহ স্থানে রাত কাটিয়েছি। কাজেই, তার কথায় আমি ভয় পেলুম না—এখানে চলে এলুম।”

ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া কিরণবাবুর নিকট তাঁহার চরিত্র ও আচরণ পরিষ্কার হইয়া গেল। শাস্তি-প্রিয় মানুষ,—হয়ত কোন আঘাত পাইয়া দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন ; কোন ফল হয় নাই ; শেষে শান্তিরই আশায় এই নির্জন কুঠীতে বাসা বাঁধিয়াছেন। ভদ্রলোকটী যে পূজা-অর্চনা এবং পড়াশুনা লইয়া সর্বদা বাস্তব থাকেন, এ ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। প্রথম পরিচয়ে বেশী কিছু প্রশ্ন করা ভদ্রতা-সঙ্গত হইবে না বলিয়া, কিরণবাবু ভদ্রলোককে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন-সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। নানা রকম আলাপ-আলোচনায় সে দিনের মত বৈকালটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে কিরণবাবু

বিদায় লইবার জন্ত উঠিলেন, ভদ্রলোকও গামছা লইয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন—স্নানের জন্ত; তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হইয়াছে। যাইবার সময় অশোক বলিল, “তবে আসি মাষ্টার মশায়, কাল আবার আস্ব।” কিরণবাবুর কাণে এই সম্বোধনটা ভাল লাগিল না। এই সরল অমায়িক সাধু-প্রকৃতির লোকটিকে একটা অনাস্বীয় সম্বোধনে ডাকা ভাল দেখায় না,—তিনি বলিলেন, “এবার থেকে ওঁকে কাকাবাবু বলে ডাকবে, অশোক।” আদেশটা অশোকের বড় ভাল লাগিল। এমন মাগুষটিকে আপনার আত্মীয় বলিয়া ভাবিতে তাহার বড় ভাল লাগিল। এবার সে বলিল, “তবে আসি কাকাবাবু।” “এস বাবা, এস, আবার কাল ঠিক এস,” বলিয়া ভদ্রলোক তাহাদের বিদায় দিলেন। কিরণবাবু অশোককে লইয়া কুঠী হইতে বাহির হইলেন। সমস্ত রাস্তা চলিতে চলিতে কিরণবাবু ভাবিতে লাগিলেন, ভদ্রলোকের নামই কি প্রশান্ত কুমার রায়! তাঁহার মনে হইল ইনিই অধ্যাপক রায়। লোকটির প্রতিভাব্যঞ্জক আকৃতি, আলাপ-আলোচনার প্রকৃতি ভদ্র ও শিক্ষিত মনেরই পরিচায়ক। আলাপ যখন হইল তখন ক্রমে সবই জানা যাইবে। আপাততঃ কিরণবাবু বুঝিলেন, ভদ্রলোক জীবনে খুব আঘাত পাইয়াছেন। সেই জন্তই বর্তমানে অধ্যয়ন ও সাধন-ভজনই ইহার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ। এই দুটি নিশ্চিত্ত ভাবে করিতে পারিবেন বলিয়াই, ইনি এই নির্জ্ঞান কুঠীতে আশ্রয় লইয়াছেন।

(৭)

সেই দিন হইতে অশোক ও কিরণবাবু প্রায়ই কুঠীতে আনা-গোনা করিতে লাগিলেন। যেদিন দুই পিতা-পুত্রে এক সঙ্গে আসিতেন

সেদিন কিরণবাবু প্রশান্তবাবুর সহিত নানারূপ আলোচনায়'রত থাকিতেন, আর অশোক কুঠার কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিরণবাবু ইহার ব্যক্তিগত জীবন-সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে পারেন নাই; শুধু জানিতে পারিয়াছিলেন, ইহারই নাম প্রশান্ত কুমার রায়। কিরণবাবু দুই একবার ইহার অতীত জীবনের কথা পাড়িয়া দেখিয়াছিলেন, বিগত জীবনের কথা শুধাইলেই ইহার মুখ মলিন হইয়া যায়, চোখ দুটি চন্ চন্ করিয়া উঠে। এইজন্ত কিরণবাবু এসম্বন্ধে আর কখনও কোন প্রশ্ন করেন নাই। অল্পদিনের মধ্যেই দুজনের মধ্যে অত্যন্ত হৃদয়তা জন্মিয়া গেল। প্রশান্তবাবু কিরণবাবুর চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। এই জন্ত কিরণবাবু প্রশান্তবাবুকে 'ভায়া' বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রশান্তবাবুও কিরণবাবুকে দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিরণবাবুর স্নিগ্ধ অহুরোধে প্রশান্তবাবু একদিন বনতুলসীতে তাঁহার বাড়ীতে গেলেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত বাড়ী, কিরণবাবুর বিশাল গ্রন্থাগার, বিস্তৃত উদ্যান প্রভৃতি দেখিলেন। তিনি কিন্তু এক গ্লাস সরবং ছাড়া আর কিছুই খাইলেন না। বিশেষ আপত্তি করায় কিরণবাবু আর জেদ করিলেন না, ভাবিলেন, সাধনপথে হয়ত কোন নিষেধ আছে। কিরণবাবু লক্ষ্য করিলেন, প্রশান্তবাবু বনতুলসীতে আসিয়া একমাত্র তাঁহার বা অশোকের সহিত ছাড়া আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। অত্যন্ত প্রয়োজন স্থলে 'হাঁ' 'না' দিয়াই কাজ শেষ করিলেন।

লোকটীর সহিত কিরণবাবুর এত মেলামেশা তাঁহার কোন কোন বন্ধু-বান্ধব ও অহুচরদের মোটেই ভাল লাগে নাই। তাহারা অনেকেই তাঁহাকে এই সন্দেহজনক লোকটীর সহিত মিশিতে, অস্ততঃ, অতঃসন্নিষ্ঠতা করিতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু কিরণবাবু কাহারও কথা কানে তুলেন নাই। তিনি মানুষ চিনিতেন। দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে

পাড়া গাঁয়ে বাস করিতে হইয়াছিল। উপযুক্ত সঙ্গীর অভাব তিনি অতিশয় অনুভব করিতেন। কাজেই, এখন এমন একজন হুশিক্ষিত সাধু-প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে অতটা মেলামেশা না করার পরামর্শ যাহারা তাঁহাকে দিল, তাহাদিগকে তিনি আত্ম-মধ্যাদা-জ্ঞানশূন্য, স্বার্থপর স্তাবক বলিয়াই মনে করিলেন। কিরণবাবুও হুশিক্ষিত মানুষ। তবু তাঁহারও মনে হইল, প্রশান্তবাবুর সাহচর্যে তাঁহার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হইতেছে। কিরণবাবু প্রশান্তবাবুর বিজ্ঞান প্রসারতা দেখিয়া দিন দিন বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানের এমন কোন বিভাগ ছিল না, যে বিষয়ে প্রশান্তবাবু তাঁহাকে নূতন কিছু না শুনাইতে পারিয়াছেন। পাশ্চাত্য দর্শনে কিরণবাবুর বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। দুই জনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ার পর হইতে, কুঠীর বারান্দায় দুইখানি মোড়ায় বসিয়া দুই জনে প্রায়ই এবিষয়ে আলোচনা করিতেন। প্রশান্তবাবুর সহিত আলোচনায় পিথাগোরাস, জেনোফোন, পারমেনাইডিস, হিরাক্লিটাস প্রভৃতি প্রাকসক্রেটীস-যুগের দার্শনিকদের সম্বন্ধে কিরণবাবুর একটা ধারণা জন্মিল। সক্রেটীস, প্লেটো এবং এরিস্টটলকে দার্শনিক চিন্তার জন্মদাতা যে কেন বলা হইয়া থাকে, তাহা তিনি বুঝিলেন। খৃষ্ট-পরবর্তী মধ্যযুগীয় দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইব্‌নিৎস এবং লকের সহিতও তাঁহার পরিচয় হইল। কান্ট, বার্কলে, হেগেল, ফিক্টে এবং শেলিং-এর আদর্শবাদ; কঁং-এর বাস্তববাদ; মিল, বেন, হিউম প্রভৃতির সন্দেহবাদের আলোচনায় দুই জনের বহু অলস অপরাহু অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রশান্তবাবুর সাহায্যে কিরণবাবু এই বিষয়ে নানা পুস্তক পড়িয়া ফেলিলেন। প্রশান্তবাবুর আগ্রহাতিশয্যে কিরণবাবু আধুনিক দার্শনিক চিন্তার সহিত পরিচিত হইবার নিমিত্ত হেক্কেল, গ্রীণ, ব্রাড্‌লে, বার্গসোঁ, প্রভৃতির বহু বই আনাইলেন ও পড়িয়া

ফেলিলেন। এই সব চিন্তানায়কদের বুদ্ধির প্রার্থ্যা, জ্ঞানের প্রসারতা, এবং সত্যকে জানিবার অপরিসীম চেষ্টা কিরণবাবুর মনে একটা স্থায়ী রেখাপাত করিয়া দিল। ঈশ্বর আছেন কি নাই, বস্তুর প্রকৃতি ও গঠন, জ্ঞানলাভের উপায় ও সীমা এই কয়েকটা বিষয় লইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত চিন্তার স্রোত বহিয়া গেল! কত পুরাতন মত ভাঙিল, কত নূতনমত গড়িয়া উঠিল। ভাঙ্গা-গড়ার এই অফুরন্ত খেলার ভিতর, সত্যকে জানিবার জন্ত যাহারা জীবন-পাত করিলেন তাঁহারা কিন্তু অমর হইয়া রহিলেন। নিমন্ত্ৰ, আলোকহীন, দুর্গম অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মাতুষ যদি দেখে যে, সে সূর্যালোকোদ্ভাসিত কল্লোলিত মহাসিন্ধুর তীরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে তাহার মনে যে আনন্দ হয়, এই সব বই পড়িয়া কিরণবাবুর মনেও ঠিক সেইরূপ আনন্দ হইল। এজন্য তিনি প্রশান্তবাবুর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বোধ করিলেন। এই অল্প বয়সে লোকটা এত জ্ঞান কোথায় পাইলেন ভাবিয়া, সময়ে সময়ে তাঁহার বিস্ময় বোধ হইত। এমন একজন সুপণ্ডিত লোক, যে অতি সহজেই ধন ও যশের উচ্চুড়ায় পৌঁছিতে পারিত, সে যে কোন্ বেদনায় আজ সব-কিছু ছাড়িয়া দিয়া এই নির্জন কুঠীতে বাস করিতে আসিল, ইহা কিরণবাবু ভাল বুঝিতে পারিলেন না। কিরণবাবু যতটুকু জানিতে পারিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, আজকাল প্রশান্তবাবু অধিকাংশ সময় সাধন-ভজনেই ব্যাপৃত থাকেন। বাকী সময়টুকু তিনি পড়াশুনায় নিয়োগ করেন। বিংশ-শতাব্দীর শিক্ষিত যুবক, ধন ও মান যাহার মুঠার মধ্যে, পূজার্তনার মধ্যে সে যে কি অমৃতের আনন্দ পাইয়াছে তা সেই জানে!

কাজের চাপে কিরণবাবু সব সময় বৈকালে কুঠীতে যাইতে পারিতেন না। যেদিন তিনি না যাইতেন সেদিন অশোক একাই তাহার কাকাবাবুর কাছে যাইত। কাকাবাবুর সহিত সে নদীর

ধারে, অথবা নদীর ওপারে সাঁওতাল পল্লী ছাড়াইয়া বহুদূর বেড়াইয়া আসিত। পথ চলিতে চলিতে কাকাবাবু অতীত কালের বীরদের ও মহাশ্বাদের নানা গল্প করিতেন। কাকাবাবুর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প শোনা অশোকের নিকট বড়ই লোভনীয়। ইহার বিনিময়ে সে তাহার সর্বস্বও দিয়া দিতে পারিত। কিরণবাবু যেদিন প্রশান্তবাবুর সহিত গল্প জুড়িয়া দিতেন, আর প্রশান্তবাবু বলিতেন, “আজ আর তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া হ’ল না, বাবা, তুমি হাতার মধ্যে বেড়াও গে”, সেদিন অশোকের বড়ই খারাপ লাগিত।

যতই দিন যাইতে লাগিল পিতা-পুত্র দুইজনে ততই প্রশান্তবাবুর প্রতি একান্ত অহরক্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর দুই জনে যেন প্রশান্ত বাবু ছাড়া পৃথিবীর অগ্র সব লোকের অস্তিত্ব ভুলিয়া গেলেন। কিরণবাবু সরল সাধু-প্রকৃতির লোক—মন্দকেও ভালভাবে দেখা তাঁহার অভ্যাস। তাহার এই দুর্বলতার জন্ত তাঁহার জমিদারীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে ভাল লোককে ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ। কাজেই, কিরণবাবুর ঠকা স্বাভাবিক। এই প্রকৃতির মানুষ যে প্রশান্ত বাবুর মত একজন প্রকৃত সাধু ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! প্রশান্তবাবুর অজ্ঞাত বাস, আত্মগোপন প্রভৃতির জন্ত সাধারণ মানুষ তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত—কিরণবাবুর মনে কিন্তু কোন সন্দেহ স্থান পাইত না। প্রশান্তবাবুর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়া কিরণবাবুর মনে ধারণা হইল, ইনি অপূর্ব মানুষ, খাঁটি সোনা।

(৮)

রবিবার দিন অশোক সকালেও কুঠীতে যাইত। দুই একদিন গিয়া দেখিত তখনও পর্য্যন্ত কাকাবাবুর পূজা শেষ হয় নাই। প্রশান্তবাবু

রাত্রি ৪টায় স্নান করিয়া পূজায় বসেন। পূজা শেষ করিয়া তিনি এক গ্লাস মিছরীর সরবত খান। যেদিন অশোক যায় সেদিন সেও ভাগ পায়। রবিবার সকালে পূজা সারিয়া অশোককে ব্যায়াম শেখানো প্রশান্তবাবুর একটা কৰ্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সুন্দর বুদ্ধিমান শিশুটি যখন তাঁহার এত সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ইহার মঙ্গল-উন্নতির চেষ্টা করা তিনি কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি অনেক পড়াশুনা করিয়াছিলেন। আশা ছিল, নিজের শিশুপুত্র-দিগকে এই শিক্ষা দ্বারা প্রকৃত মানুষ্য করিয়া তুলিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অগুরুপ—তিনি তাহাদের একসঙ্গে কাড়িয়া লইলেন। তারপর অরণ্য-কান্তার-নদী-পৰ্বতে কতকদিন শান্তির আশায় ঘুরিয়া, শেষে পাইলেন এক মহাপুরুষের দেখা। জীবনে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিয়া তিনিই তাঁহাকে আবার দেশে পাঠাইয়া দিলেন। হিমালয়ের কোলে যে শান্তি তাঁহাকে দেখা দিয়াছিল, ধূম-ধূলিসমাচ্ছন্ন কোলাহলময়ী কলিকাতায় আসিয়া তাহার আর দেখা পাওয়া গেল না। এখানে আসিয়া তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের সেই অংশ, যেখানে আশ্রমবাসী শারদ্বত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া শাঙ্গরবকে বলিতেছেন,

অভ্যাক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধইব স্তম্ভম্

বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিব স্তম্ভসঙ্গিনমবৈমি ॥

কোলাহলময়ী নগরী তপোবনবাসীদের যে বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল, সেই বিরক্তি যেন তাঁহারও মনে দেখা দিল।

সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায়। সংসারে অধিক লিপ্ত না হইলেই হইল, গুরুর নিকট এই উপদেশ পাইয়া তিনি দীর্ঘকাল পরে কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন এখানে তাঁহার দ্বৈপ্সিত জীবন-যাপন অসম্ভব, তখন বাঙ্গলার একপ্রান্তে এই

নির্জন কুঠীর সন্ধান পাইয়া তিনি এখানেই ছুটিয়া আসিলেন। কিছু দিন এখানে বাস করার পরই অশোক ও তাহার বাবার সহিত পরিচয়। ইহাদের সাহচর্য্য তাঁহার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে না বলিয়া, তিনি ইহাদের সমাদরের সহিতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাজার হউক, তিনি ত আর সন্ন্যাসী নহেন, এই সমাজেরই মানুষ। বিশেষতঃ অশোক ছেলেটিকে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। ছেলেটির সুন্দর আকৃতি ও স্বভাব এবং প্রতিভার জ্ঞা প্রশান্তবাবু তাহার প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, দেহ ও মনের পরিপুষ্টি হইলে ছেলেটা কালে দেশের ও দশের মধ্যে একজন হইয়া উঠিবে। অশোকের মানসিক অথবা শারীরিক উন্নতির জ্ঞা তিনি সর্বদাই সচেষ্টি থাকিতেন এবং অশোকের আহার-বিহার, শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতির সম্বন্ধে কিরণবাবুকে সর্বদা পরামর্শ দিতেন। যেদিন বৈকালে অশোক না আসিত সেদিন প্রশান্তবাবুর আর কিছুই ভাল লাগিত না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল রাজর্ষি ভারতের কথা। সংসারের মায়া কাটাইয়া যিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির জ্ঞা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন তিনিও কিনা একটা মৃগ-শিশুর মায়ায় বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। মৃত্যুর সময়েও ঈশ্বরচিন্তার পরিবর্তে মৃগ-শিশুর চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিল! পরজন্মে রাজর্ষি ভারত মৃগরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এক এক সময় ভাবিতেন, তাঁহারও অবস্থা কি রাজর্ষি ভারতের মত হইবে।

অত্যধিক প্রশ্রয়, বিলাসিতা, অহঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা ধনীর দুলালেরা নষ্ট হইয়া যায়। ধনীপুত্র হইলে ভবিষ্যৎ উন্নতির যে সুবিধা পাওয়া যায়, পরিণামে ইহাই তাহাদের কাছে পরম অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যে ধনীর পুত্রকে শিক্ষা দিয়া সংপথে রাখিবার মত অভিভাবক আছে, যে ধনী সম্ভানের ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা আছে সংসারে সেই ভাগ্যবান।

সংসারকে সে অনেক কিছুই দিতে পারে। অশোকের মা শিক্ষিতা ও কোমল-হৃদয়া এবং সঞ্চয়ের কল্যাণ, কীরণবাবুও বুদ্ধিমান এবং স্থপণ্ডিত। এমন আদর্শ পিতামাতার সন্তানের যে সকল গুণ থাকা উচিত অশোকের মধ্যে তাহা প্রচুর পরিমাণেই ছিল। পড়াশুনায় সে বড় ভাল ছেলে—ক্লাসে ফার্স্ট হয়, স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সে বহু ভাল ভাল পুস্তক পড়িয়া ফেলিয়াছে। তাহার স্বাস্থ্যও বেশ ভাল। তাহার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উভয়ের প্রতিই কীরণবাবুর যথেষ্ট মনোযোগ। অল্প বয়সেই অশোকের মন খুব উন্নত। নিজের বন্ধুবান্ধবদের সে অন্তরের সহিত ভালবাসে। গরীব লোকদিগকে নিজের কাছে যাহা থাকে তাহা দিয়াই সাহায্য করে। সে খুব বিদ্বান হইবে, নূতন নূতন আবিষ্কার করিবে এবং লোকের ভাল করিবে অল্প বয়সেই সে এইসব কথা ভাবিত। প্রশান্তবাবুর সাহায্যে তাহার খুব উপকার হইল। তাহার শিক্ষায় তাহার হৃদয় ও মন দুই-ই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রশান্তবাবুও মনে ধারণা হইল, ছেলেটা বাঁচিয়া থাকিলে একজন মানুষ হইবে।

প্রশান্তবাবু আসার পর হইতে অশোকের কাছে, প্রশান্তবাবু ব্যতীত অপর সকল বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক, স্কুল প্রভৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহার মনে, তাহার বাবা মা ছাড়া কেবলমাত্র আর একজনেরই ভক্তি প্রদান আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিল—ইনি প্রশান্তবাবু। প্রশান্তবাবুর কুঠীতে আসার দুই বৎসর পর মাইনর পরীক্ষায় বিভাগেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়া সে গ্রাম হইতে সদরের স্কুলে পড়িতে গেল। অশোক মাইনর পাশ করিলে স্কুলটা হাইস্কুলে পরিণত করিবেন, বহুদিন হইতে কীরণবাবুর এই সঙ্কল্প ছিল। অশোক পাশ করিলে সে সঙ্কল্প তিনি কাজে পরিণত করিতে পারিলেন না। কয়েক বৎসর হইতে জমিদারীর অবস্থা ভাল যাইতেছিল না; তার উপর পৈতৃক ঋণের অঙ্কটাও দিন দিন ভারী হইয়া উঠিতেছিল।

(৯)

ব্রিটিশ পাইয়া অশোক জেলার সরকারী স্কুলে পড়িতে আসিল। সহরের লোকজন, গাড়ীঘোড়া, সরকারী স্কুলের মোটা মাহিনাভোগী গম্ভীর মূর্তি শিক্ষকগণ, স্কুলের ফ্যাশানেবল ছাত্রের দল এবং স্কুল-বোর্ডিং-এর শক্ত নিয়ম-কানূনের মধ্যে তাহার মন ইপাইয়া উঠিতে লাগিল। এখানে মুক্ত উদার মাঠ নাই, গ্রাম্য বালকদের সারলা নাই, শিক্ষকদের স্নেহ নাই, বাবা-মা নাই, কাকাবাবু নাই। অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে তাহার কয়েক দিন কাটিল। কলেজে গিয়া যখন সে ওয়ার্ডসওয়াথের কবিতায় পড়িল লণ্ডনের জনাকীর্ণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া একটা পাখীর পরিচিত ডাক শুনিয়া পল্লীবালিকা তাহার জন্মভূমি স্বদূর পল্লীর স্বপ্ন দেখিতেছে :—

A mountain ascending, a vision of trees ;
Bright volumes of vapour through Lothbury glide,
And a river flows on through the vale of cheapside.
Green Pastures she views in the midst of the dale,
Down which she so often has tripp'd with her pail,
And a single small cottage, a nest like a dove's,
The one only dwelling on earth that she loves.
She looks and her heart is in heaven. কঠোর সত্যের
রুঢ় আঘাতে পরক্ষণেই—they fade :

The mist and the river, the hill and the shade,
The stream will not flow, and the hill will not rise,
And the colours have all pass'd away from her eyes.

তখন তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল, বহু বৎসর আগে বাড়ী হইতে বোর্ডিং আসিয়া, পল্লীর জন্ত তাহারও প্রাণ এমনি করিয়া কাঁদিয়া

উঠিত। বনতুলসী, বগডাঙ্গার মাঠ, রেশম কুঠি, ক্ষীরালি নদীর স্মৃতি তাহাকেও এমনি পীড়িত করিয়া তুলিত।

অশোক মিশুক ছেলে, অথচ স্কুলে কিন্তু সে কোন ছেলের সঙ্গেই বড় একটা ভাব করিতে পারিল না। তাহার বেশভূষার পারিপাট্য ছিল না, মুখে কথাই থৈ ফুটিত না—যে যে গুণ তাহার সহপাঠীদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। সহপাঠীদের কথাবার্তাও সে ভালরূপ বুঝিতে পারিত না। ফিল্ম কাহাকে বলে তাহা সে বুঝে, কিন্তু ‘ফিল্ম-ষ্টার’ কাহাদের বলে সে তাহা বুঝিল না। একদিন ক্লাসে অভিনয় সম্বন্ধে ছেলেদের মধ্যে খুব আলোচনা হইতেছিল। রঙ্গমঞ্চের কোন অভিনেত্রী সব চেয়ে ‘বিউটিফুল’, কে সব চেয়ে বেশী মাহিনা পায়, কোন অভিনেতার ‘মেক-আপ’ ভাল, কাহার ‘ডেলিভারী’ ভাল এ সম্বন্ধে ক্লাসের অনেককেই বেশ ওয়াকিব-হাল দেখিয়া অশোক বিস্মিত হইল। অশোক নিজের এ বিষয়ে অজ্ঞতায় বেশ একটু লজ্জিতই হইল। বাবা কিম্বা কাকাবাবুর মুখে সে অনেক রকম আলোচনাই শুনিয়াছে, কিন্তু এগুলি ত তাঁহারা জানেন না!

দিন কতক যাইতে না যাইতেই সে দেখিল, ক্লাসে তাহার অনেক-গুলি ঠাট্টা মৃচক নাম হইয়াছে—“এইটিন্থ সেন্চুরি,” “পিউরিটান,” “বুক-ওয়াম,” “গুড-বয়” ইত্যাদি। বৃত্তি পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিলেও ক্লাসের ছেলেরা তাহাকে তেমন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না। একটীমাঁজ ছেলের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল। এই ছেলেটিও একটা পাড়া গাঁয়ের স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া পড়িতে আসিয়াছিল। ছেলেটির নাম হরিসাধন পাল। এই ছেলেটিও তাহার মত বোর্ডার। ছেলেটি বড় গরীব। একজন জমিদারের প্রদত্ত টাকা হইতে বোর্ডিংএ একজন দরিদ্র ছাত্রকে বিনা খরচে রাখা হয়। ভাল ছেলে বলিয়া হরিসাধন এই সুবিধাটা পাইয়াছে। হরিসাধন ও অশোক দুই জনেরই

সিট্.একই ঘরে হইয়াছিল। বোর্ডিংএ ছাত্র অত্যন্ত কম। যেমন অশোকের পেছনে তেমনি হরিসাধনের পেছনেও ছেলেরা লাগিয়াছিল। কতকটা এই কারণেও তাহাদের মধ্যে খুব শীঘ্র ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। ক্লাসের মধ্যে অশোকের এই অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইল না। এক শনিবারে স্কুলে ডিবেটিং ক্লাবের অধিবেশন হইল—আলোচ্য বিষয় ছিল, প্রাণদণ্ড উচিত কিনা। অশোককে তাহাদের ক্লাস-টিচার মহাশয় প্রাণদণ্ডের বিপক্ষে কিছু বলিতে বলিলেন। বক্তৃতা দেওয়ায় অশোকের অভ্যাস নাই,—গ্রামের স্কুলে প্রাইজের সময় সে আবৃত্তি প্রভৃতিই করিয়াছে। অশোকের একবার মনে হইল, এবিষয়ে তাহাকে লিখিতে দিলে সে খুব ভাল লিখিয়া দিতে পারে। এই বয়সেও তাহার পড়াশুনা পাঠ্য-পুস্তকের গণ্ডি বহুদূর অতিক্রম করিয়াছে। সে যাহা হউক, মাষ্টার মহাশয়দের অনুরোধে সে বলিতে উঠিল। প্রথমে দুই একটা কথা মুখে আটকাইল, পা দুটা যেন কেমন কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু সে ক্ষণিকের জ্ঞা। প্রাণদণ্ডের বিপক্ষে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুদ্ধ ভাষায় চমৎকার একটা বক্তৃতা দিল। তাহার বক্তৃতা শুনিয়া হেড্‌মাষ্টার মহাশয় ও অন্যান্য শিক্ষকেরা অতিশয় বিস্মিত হইয়া অজস্র প্রশংসা করিলেন। সেদিন আর কেহ তাহার মত বলিতে পারিল না। এমন কি, স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ফাষ্ট ক্লাসের অরুণ সেনের ডিবেটও তাহার বক্তৃতার কাছে নিস্ত্র হইয়া গেল। ছাত্রদের বলা শেষ হইলে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় স্বয়ং অশোকের প্রচুর প্রশংসা করিলেন ও বলিলেন, এই ভাবে চর্চা করিলে সে দেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা হইবে। হলের বাহিরে আসিতেই হরিসাধন তাহাকে অভিনন্দিত করিল। ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরাও ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কাঁধে চড়াইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। ফিল্মষ্টারদের ভক্তরা আর যাহা হউক না কেন, তাহারাও গুণ-গ্রাহী,—তাহাদের ক্লাসের একজন ছেলে আজ

ফাষ্ট ক্লাসের অরুণ সেনকেও হারাইয়া দিয়াছে—এ আনন্দ তাহাদের রাগিবার আর জায়গা নাই। কে জানিত তাহাদের মিঃ “এইটিস্ সেনচুরি” বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞা-বুদ্ধিতে এখনই এত সুদক্ষ! বন্ধুদের এত সমাদরে অশোকের বড়ই লজ্জা বোধ হইল। তাহার মনে হইল, ছেলেগুলি একটু ‘চালিয়াং’ হইলেও মানুষ বড় ভাল। তাহা না হইলে তাহার রুতকার্য্যতায় এত আনন্দ বোধ করিবে কেন। অশোক আজ তাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করিল। তাহাদের উভয় পক্ষেরই মনের কপাট পরস্পরের নিকট খুলিয়া যাওয়ায়, উভয়ে উভয়কে ভাল করিয়া বুঝিবার সুযোগ পাইল। সেই দিন হইতে অশোকই ক্লাসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইল। সব ব্যাপারেই ক্লাসের ছেলেরা তাহার পরামর্শ লইতে লাগিল। স্বল্পভাষী লাজুক পাড়ার্গেয়ে লাষ্ট-বেঞ্চির অশোক ক্লাসের মধ্যে সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

(১০)

হরিসাধন যে গরীবের ছেলে তাহা অশোক তাহারই কাছে শুনিয়াছিল। তাহাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশোক তাহার জীবনের অনেক কাহিনীই জানিতে পারিল। হরিসাধনের বাবা কোন একটা কলিয়ারীতে সামান্য বেতনে কাজ করিতেন। বহর চারেক আগে তাহার বাবা একদিন শ্রমিকদের লইয়া খাদে কাজ করিতেছিলেন। এমন সময় খাদে আগুন ধরিয়া যায়। এই ব্যাপার এত ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, বাহির হইতে কোনই সাহায্য পাঠান সম্ভবপর হয় নাই। এই ভীষণ আগুনে সঙ্গে সঙ্গে খাদের নীচে সকলের মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া আগুন নিভাইবার জন্য খাদের মুখ বাহির হইতে সীল করিয়া দেওয়া হয়। শিতার শবদেহ দেখার সুবিধাও

হরিসাধনের হয় নাই। এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় হরিসাধনের মা-পাগলের মত হইয়া যান। খনির নীচে তাহার বাবা কুলিদের কাজের তদন্ত করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ বিষাক্ত গ্যাসে তাহাদের শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। খনির এক প্রান্তে বৈখানরের জিহ্বা লক্ লক্ করিতে দেখা গেল। প্রাণভয়ে ভীত নরনারী পলাইবার জগ্ বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই, আগুন—আগুন চারিদিকে আগুন।... হরিসাধন বলে, স্বপ্নে প্রায়ই এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। কোম্পানী হইতে হরিসাধনরা কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ পায়। সে টাকা তাহাদের পুরুষানুক্রমে আগত ঋণভার লাঘবের জগ্ মহাজনের সিন্দুকে আশ্রয় লইয়াছে। তাহার পিতার মৃত্যুতে তাহার মা পরের বাড়ীতে মুড়ি ভাজিয়া, জল তুলিয়া দিন চালান। এই ভাবেই তিনি হরিসাধনকে মাইনর পর্যন্ত পড়াইয়াছেন। হরিসাধন বলে, নেহাৎ সে একটা স্কলারশিপ্ পাইয়া গেল, আর বোর্ডিং-ফ্রি-টা জুটিয়া গেল-তাই সে পড়িতে আসিল। নতুবা যাহার মাকে পরের দাসীবৃত্তি করিয়া দিন চালাইতে হত তাহার কি আর ইংগাজী স্কুলে পড়া সাজে! তাহার বৃকে যে কত ছুংখের গুরুভার চাপান আছে, তাহা এতদিন সে কাহাক্লেও জানিতে দেয় নাই। অশোকের মত সমবেদনা প্রবণ অকপট বন্ধুর নিকট সে তাহাদের জীবনের নানা লাঞ্ছনা, নানা অপমানের কথা খুলিয়া বলিল। জীবনের এই দিকটা অশোকের নিকট ছিল অজ্ঞাত। সংসারে দারিদ্র্য আছে, কিন্তু তাহার রূপ যে এত কুশ্রী ও রুঢ় তাহা তাহার জানা ছিলনা। হরিসাধন একদিন তাহার নিকট গল্প করিল, তাহার বয়স যখন কম তখন তাহার মা একদিন জমীদার বাড়ীতে মুড়ি ভাজিতে গিয়াছিলেন—সেইদিন জমীদার বাবুর পৌত্রের গলার গিনির মালা হারাইয়া যায়। নিজের পারিভ্রমিক কয়েক সের মুড়ি একটা ধামায় লইয়া

যখন তিনি খিড়কি দিয়া বাহির হইতেছেন, তখন একটা দ্বারোয়ান আসিয়া এক প্রচণ্ড ধমক্ দিয়া বলিল,—“এই মাগী, তোর ধামা দেখি, তুই গিনির মালা চুরি করেছিস্।” এই কথা বলিয়া সে তাহার মায়ের হাতের ধামাটা ছিনাইয়া লইয়া মুড়িগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল। মুড়ির মধ্যে মালা ছড়াটা না পাইয়া দ্বারোয়ানটা তাঁহার গায়ে হাত দিতে যাইতেছিল, তখন সে ও তাহার মা ইহাতে ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে জমীদার বাড়ীর অন্যান্য লোকজন সেখানে আসিয়া পড়ায় আর বেশী কিছু দ্বারোয়ানটা করিতে পারে নাই। এই সব বলিতে বলিতে হরিসাধনের চোখ জলিয়া উঠে। সে বলে, সে তখন ছোট ছিল বলিয়া ভয় পাইয়া চোঁচাইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার চোখের সামনে তাহার মাকে অমন ভাবে কেহ অপমান করিলে সে হয়ত তাহাকে খুনই করিয়া ফেলিতে পারে। এই সব শুনিয়া অশোক একটা কথা ভাবে,—তাহার বাবাও একজন জমিদার, তাহাদের বাড়ীতেও দরিদ্র অন্নগ্রহগ্রাথী অনেকে যাতায়াত করে, ইহারা কেহ তাহাদের দ্বারা লাক্ষিত হয় না ত !

হরিসাধন মাসের শেষে স্ফলারশিপের টাকা হইতে তিন টাকা তাহার মাকে পাঠাইয়া দিত। তাঁহার বয়স হইয়া আসিতেছে, গতর খাটাইয়া সংসার চালান তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব নয়। কিছুদিন হইতে তাঁহার শরীরও বড় খারাপ যাইতেছে। বাকী দুইটাকাও হরিসাধনের কাগজ, বই জলখাবার ইত্যাদির খরচ চলে। অশোকের বাবা তাহাকে যদিও খুব বেশী টাকা পাঠান না, তবুও সব সময় অশোকের হাতে কিছু টাকা থাকে, ও তাহার মা-বাড়ী হইতে আসিবার সময় তাহাকে কিছু টাকা দেন। অশোকের মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হয় হরিসাধনকে কিছু সাহায্য করিবার। হরিসাধনের কিন্তু আত্মসম্মান বোধ খুব বেশী। অশোককে সে ভাইএর মত

ভালবাসিলেও সে তাহার নিকট ভিক্ষা লইতে প্রস্তুত নহে। সাহায্য দানের প্রস্তাব করিলে পাছে ব্যথিত হরিসাধন অপমানিত বোধ করে এই ভয়ে অশোক এরূপ কোন প্রস্তাব করিতে কোন দিন সাহস করে নাই।

বোর্ডিংএর প্রত্যেক ছেলেই দুধ খায়, হরিসাধন পয়সার অভাবে দুধ খায় না। অশোক তাহাদের দুজনের জুটাই দুধের 'রোজ' করিয়াছিল। হরিসাধন প্রথম দিন দুধ খাইল বটে, তবে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। সে অশোককে বলিয়া দিল, দুধ খাওয়া তাহার কোন দিন অভ্যাস নাই দুধ তাহার সহ্য হয় না, পরের দিন হইতে যেন অশোক তাহার জুট দুধ না লয়। অশোক বুঝিল অর্থকষ্ট তাহার জুটাই হরিসাধন দুধ খাইবেনা। "তোমার দুধের পয়সা আমিই দিয়া দিব" বলিলে, সে খুব অপমানিত বোধ করিবে আবার সে যদি দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলেও হরিসাধন এই স্বাথত্যাগে লাক্ষিত এবং ক্ষুব্ধ হইবে। অনেক ভাবিয়া অশোক দেখিল, হরিসাধনের মনে আঘাত না দিতে হইলে তাহার দুধ খাওয়া উচিত। প্রত্যেক দিন বৈকালে বেড়াইতে যাইবার সময় চাকর এক ঘাস গরম দুধ অশোকের টেবিলের উপর রাখিয়া যাইত। স্মৃষ্টি ঘন দুধ অশোকের মুখে অত্যন্ত বিস্বাদ মনে হইত, কিন্তু উহা না খাইবার উপায় ছিল না। না খাইলেই হরিসাধনের মনে উঠিতে পারে বড়লোকের ছেলে অশোক তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জুটাই দুধ খাওয়া ছাড়িয়াছে।

হরিসাধনের দারিদ্র্য যে তাহার আত্মাকে কিরূপ পীড়িত করে, তাহার আর একটা পরিচয়ও অশোক শীঘ্র পাইল। তাহাদের বোর্ডিংএ আসার প্রথম মাসের শেষে বোর্ডিংএ একটা ফিষ্ট হইল। পড়াশুনা শেষ করিয়া বোর্ডিংএর ছেলেরা সকলে মিলিয়া খাইতে বসিয়াছে, হরিসাধন বসিয়াছিল অশোকের ঠিক সামনেই। দুই একখানা মাত্র

লুচি খাইয়াই হরিসাধন হঠাৎ উঠিয়া পড়িল ; ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল, তাহার শরীর ভাল নাই। অশোক ইহাতে একটু আশ্চর্য হইল—এই মিনিট পাঁচেক আগেই দুই জনে প্রফুল্ল মনে খাইতে আসিয়াছিল। হঠাৎ ইহার মধ্যে হরিসাধনের কি অসুখ হইল ! খাওয়া শেষ করিয়া রুমে আসিয়া সে দেখিল, হরিসাধন বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। হরিসাধন অশোকের চেয়ে বয়সে বড়, অশোক তাহাকে ‘সাধন দা’ বলিয়াই ডাকিত। অশোক তাহাকে এইভাবে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, “কি হয়েছে সাধন দা, শুয়ে পড়লে কেন ? আজ ভাল করে খেলে না !” হরিসাধন বলিল, “এমনি—আর ভাল লাগলনা।” শীতকালের রাত্রি, গরম লুচি-মাংস, সন্দেশের মধ্যে ভাল না লাগিবার কারণ যে কি আছে, তাহা অশোক ঠিক বুঝিতে পারিল না। হরিসাধনের এই আচরণের নিশ্চয়ই অল্প কোন কারণ আছে ! যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে সাধন দা’ নিশ্চয়ই তাহা তাহাকে অল্প সময় বলিবে—এই মনে করিয়া অশোক আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

অশোক শুইয়া পড়িতেই হরিসাধন বলিল. “অশোক, আমি যখন আসি, তখন আমাদের বড় টানাটানি যাচ্ছিল। আমার মা হয়ত একবেলা খেয়ে দিন চালাচ্ছেন। আজ রাত্রে লুচি খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর কথা। গ্রাস আর মুখে উঠল না ভাই, তাই চলে এলাম।” ইহার উত্তরে সাধনের ছলেও কিছু বলা চলে না। অশোক তাই চুপ করিয়া রহিল। ঘুম আসিবার পূর্ব পর্যন্ত সে ভাবিতে লাগিল। মাহুখে মাহুখে কেন এই বৈষম্য ? পৃথিবীতে ধনী থাকুক তাহাতে ক্ষোভ নাই, কিন্তু একদিকে যখন অপব্যয়ের সীমা নাই, তখন আর একদিকে লোকে পেট ভরিয়া দুই-বেলা খাইতে পাইবে না কেন ? তাহার মনে হইল এই শীতের রাত্রে লেপের নীচে

উষ্ণ শয্যার উপর সে শুইয়া আছে, অথচ পাশের বিছানায় ঐ যে হরিসাধন একটা জীর্ণ কাঁথায় কোন রকমে শরীরটা জড়াইয়া শীত ভোগ করিতেছে কি জ্ঞাত? অশোকের মনে হইল, সে বড় হইলে দরিদ্র, বঞ্চিত, সর্বস্বার্থীদের দুঃখ ঘুচাইবার জ্ঞাত যুদ্ধ করিবে—জীবনের রাজপথে উহাদেরই সঙ্গে সে অল্পমুষ্টি ভাগ করিয়া থাইবে—উহাদের বেদনা তাহাকে দূর করিতেই হইবে।

(১১)

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে কিরণবাবু ভূমিদারীর কাজে একবার সদরে আসিলেন। সহরে আসিয়াই তিনি অশোকের বোডিংএ গেলেন। অনেকদিন পরে বাবাকে দেখিয়া অশোকের মনে বড় আনন্দ হইল। কাকাবাবু, মা ও গ্রামের অগ্রাগ্র বন্ধুবান্ধবদের নানা খবর লইতে অশোক ভুলিল না। হরিসাধনের পরিচয় পাইয়া কিরণবাবু স্তম্ভী হইলেন। এই দরিদ্র, মেধাবী ছেলেটাকে তাঁহার বড় ভাল লাগিল। বোডিংএ আসিয়া অশোক সাইকেল চড়িতে শিখিয়াছিল। সে কিরণবাবুকে ধরিয়া বসিল তাহাকে একটা সাইকেল কিনিয়া দিতে হইবে। কিরণবাবু অশোকের আগ্রহ দেখিয়া কলিকাতায় একটা জানা দোকানে একটা ভাল সাইকেলের অর্ডার দিলেন। দিন সাতকের মধ্যেই সাইকেলটা অশোকের নামে রেলোয়ে পার্সেলে আসিয়া পৌঁছিতে। দুইদিন পরেই কিরণবাবু চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় হোস্টেলের ছেলেদের সন্দেশ থাইবার জ্ঞাত তিনি হরিসাধনের হাতে দশটাকা দিয়া গেলেন।

কিরণবাবু চলিয়া যাওয়ার পর অশোকের মন আবার খারাপ হইল। স্থলে আসিবার পরেই তাহার মনের ভাব এইরূপ হইয়াছিল। এই

ভাবটা কিন্তু বেশীদিন থাকিল না, দুই একদিনের মধ্যেই তাহার মনের প্রকল্পতা আবার ফিরিয়া আসিল। ইহার কিছুদিন পরেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্ত স্কুল পনের দিনের জন্ত বন্ধ হয়! বোর্ডিং-এর ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাড়া আর সকল ছাত্রই ছুটিতে বাড়ী চলিল। কিরণবাবু অশোককে লিখিয়াছিলেন, হরিসাধনকে লইয়া ছুটিতে বাড়ী আসিবার জন্ত। হরিসাধনের ইচ্ছা ছিল একবার তাহার মাকে দেখিতে যাইবার। অশোকদের আগ্রহাতিশায়ে সে শেষ পর্যন্ত তাহাদের বাড়ী যাইতে সম্মত হইল। সহর হইতে কৈয়াফুলি পর্যন্ত বাস যায়, কৈয়াফুলি হইতে তাহাদের গ্রাম পর্যন্ত গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। বৈকালের বাসে হরিসাধন ও অশোক রওনা হইল, এবং ঘণ্টাখানেক পরেই কৈয়াফুলিতে পৌঁছিল। কৈয়াফুলিতে তাহাদের বাড়ীর গরুর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। এখান হইতে বনতুলসী দীর্ঘপথ নহে। জিনিষপত্রগুলি গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া তাহারা হাঁটিতে আরম্ভ করিল। ক্ষীরালির কাছাকাছি আসিতেই অশোক বলিল, “ওই দেখ কুঠী, ওইখানে আমার কাকাবাবু থাকেন।”

হরিসাধন অশোকের কাছে কাকাবাবুর কথা কত শুনিয়াছে! কুঠীর কাছে আসিতেই তাহারা দেখিল প্রশান্তবাবু কুঠীর বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন। তাহারা কাছে যাইতেই তিনি তাহাদের কাছে ছুটিয়া আসিলেন। হরিসাধন ৭ অশোক তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। গৌরবর্ণ, প্রশান্তমূর্তি এই ভদ্রলোককে দেখিয়া হরিসাধনের মনে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হইল। তাহাদিগকে কুশল সম্ভাষণ জানাইয়া প্রশান্তবাবু বলিলেন, “সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখন আর দাঁড়িওনা বাবা, বাড়ী যাও, কাল সকালে আবার এসো।” অশোক ও হরিসাধনকে তিনি বনতুলসীর পথে অনেকদূর আগাইয়া দিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পরেই অশোক হরিসাধনকে লইয়া বাড়ী পৌছিল। অশোকের মা-বাবা হরিসাধন আসায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। হরিসাধনরা বর্ণ হিন্দু নহে—ইহার জন্ত তাহাকে সকল স্থানেই সঙ্কচিত থাকিতে হইত। বোডিংএ ছেলেদের আচার ব্যবহারে কোন জাতি-বৈষম্য নাই বটে, তবু তাহাদের অনেকে যখন তখন জাতের কথা তুলিয়া হরিসাধনকে খোঁচাইতে ছাড়িত না। ছেলেরা থাইতে বসিবে—হরিসাধনও থাইতে বসিয়াছে, এমন সময় তাহার পাশে একজন ব্রাহ্মণ ছেলে আসিয়া বসিল। বসিয়াই ছেলেটী যেন কত ভুল করিয়াছে এইভাবে উঠিয়া দাঁড়াইবে, বলিবে, নাঃ এখানে ত বসি চল্বে না, শেষে কি পৈতৃক জাতটা বাবে! অল্প ছেলেরা হো হো করিয়া হাসিবে, ছেলেটী হয়ত শেষ পর্যন্ত হরিসাধনের পাশেই বসিয়া থাইবে। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। হরিসাধনকে যে তাহার ঘৃণা করে তাহা নয়, তাহার জাতের কথা তুলিয়া একটু ‘মজা’ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। হরিসাধন এইসব ব্যাপারে মনে বড় আঘাত পায়—কাহাকেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। অশোকদের বাড়ীতে আসিয়া কিন্তু হরিসাধন আশ্চর্য্য হইয়া গেল, অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ পরিবার হইলেও সেখানে জাতি লইয়া কোন আলোচনা সে দেখিতে পাইল না। অশোকের বাপ-মা তাহার কাকাবাবু প্রভৃতির স্নেহ তাহার মনে একটা গভীর রেখা পাত করিল,—এমন সব মানুষও তাহা হইলে আছে! কাকাবাবুকে তাহার সব চেয়ে ভাল লাগিল। লোকটির সন্মুখে অশোকের নিকট কত কথাই না শুনিয়াছে, আজ তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে মিশিয়া হরিসাধনের মনে হইল তাঁহার সন্মুখে অশোকের ধারণা বর্ণে বর্ণে সত্য।

দিন দশেক পরে অশোক ও হরিসাধন হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিল। হরিসাধনকে বাড়ী লইয়া গিয়া অশোকের আর আনন্দের সীমা নাই।

হরিসাধনের মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল অশোককে একবার তাহাদের বাড়ী লইয়া যায়। নিজেদের জীর্ণ কুটীরের অবস্থা, এবং আর্থিক অবস্থার কথা ভাবিয়া সে মুখ ফুটিয়া অশোককে একথা বলিতে পারিল না। অশোকদের বাড়ী হইতে আসার কিছুদিন পরই মনিং স্কুল আরম্ভ হইল। মাসখানেক মনিং স্কুলের পর গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইল। ছেলেরা নিজের নিজের বাড়ীর দিকে রওনা হইল। অশোকও ছুটিতে বাড়ী আসিল।

(১২)

ছুটিতে আসিয়া অশোক আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাকাবাবুর পরিচয় পাইল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃষ্টি কোন বদলাইতেছে, যাহা ভালভাবে বুঝিত না, এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছে। পূর্বের প্রশান্ত-বাবুর উপর যে একটা অন্ধভক্তি ছিল এখন তাহা দূর হইয়া গিয়াছে বটে, তবে বিচার-বুদ্ধি প্রশান্তবাবুর উপর তাহার ভক্তি টলাইতে পারে নাই। দুই একদিন সাড়ে দশটার মধ্যে স্নানাহার সারিয়া সাইকেলে সে কুঠীতে আসে। আসিয়া সে প্রায়ই দেখে তখনও প্রশান্তবাবু ঠাকুর-ঘর হইতে বাহির হ'ন নাই। সে যতদূর জানে তাহাতে মনে হয়, ভোর পাঁচটায় তিনি পূজায় বসেন। রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে কবলের আসনে বসিয়া একটা লোক কি করিয়া একাদিক্রমে এতক্ষণ কাটাইতে পারে তাহা অশোকের বুদ্ধির অতীত। প্রশান্তবাবুর সহিত তাহার বাবার যে সমস্ত কথাবার্তা হয় তাহা হইতে সে মোটামুটি এইটুকু বুঝে যে প্রশান্তবাবু একজন যোগপন্থী। যোগ যে কি জিনিষ তাহা সে বুঝে না। কাকাবাবুর মত অত পণ্ডিত মানুষ যাহা করেন তাহা নিশ্চয়ই খুব ভাল জিনিষ হইবে, কেবলমাত্র সে এইটুকুই বুঝে। অশোকদের স্কুলে

একজন পণ্ডিত আছেন, তিনি ক্লাসে ধর্ম সম্বন্ধে খুব বড় বড় লেকচার দেন। হিন্দুধর্ম ছাড়া আর সকল ধর্মই যে নিকৃষ্ট ইহা প্রমাণ করিতে তিনি বড়ই বাস্তব। ছেলেরা যেন শীঘ্র শীঘ্র সদগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে—এই বিষয়ে তাঁহার তৎপরতার অন্ত নাই। কোন ছেলে তাঁহার বাক-মহিমায় ভুলিয়া দীক্ষা লইতে চাহিলে তিনি গুরু পর্য্যন্ত সাপ্লাই করিয়া থাকেন। অধিক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া কতদিন অশোক দেখিয়াছে, ক্ষীরালির কুঠীতে কাকাবাবুর পূজার ঘরে তখনও আলো জলিতেছে। অশোক ভাবিয়া আশ্চর্য্য হয়, এই মানুষের সঙ্গে সে কত ঘনিষ্ঠভাবে মেশে, কিন্তু কৈ তিনি তাহাকে ধর্মের কথা ত কিছু বলেন না! বুদ্ধির চর্চ্চা কর, মনের উন্নতি কর, শরীর দৃঢ় কর, মানুষের দুঃখ দৈন্তের সীমা নাই, বড় হইয়া যত পার মানুষের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা কর কাকাবাবু তাহাকে দিনরাত এই কথাই বলিয়া থাকেন। প্রশান্তবাবু এমনভাবে কথাগুলি তাহাকে বলেন যে, তাহা তাহার মর্মে গিয়া আঘাত করে। কাকাবাবুর মত আদর্শ মানুষ হওয়াই অশোকের কাম্য, এই ভাবেই সে নিজের জীবন গঠিত করিতে চায়।

সাড়ে দশটায় আসিয়া অশোক প্রতাহ প্রশান্ত বাবুর পূজা-শেষের প্রতীক্ষা করে। তাহার আসার কিছুক্ষণ পরেই তিনি পূজা-শেষে বাহিরে আসেন। অশোকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “তুমুর রোদ এলে কেন। খেয়ে এসেছ?” অশোক রোদ্দে আসার জন্ত প্রায়ই তিরস্কৃত হয়, তবুও আসে। ভাত খাওয়ার পর গৃহে আর সে থাকিতে পারে না। পূজার পর এক গ্লাস মিছরীর সরবত খাইয়া প্রশান্তবাবু কুঠীর ও-দিকের বারান্দায় রান্না চড়াইতে যান। উনান ধরাইয়া মাটির হাঁড়ীতে কতকগুলি আতপ চাল, আলু, কাঁচকলা ফেলিয়া দিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বই পড়েন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে

অশোকের সঙ্গে কথাবার্তাও চলে, এদিকে রান্নাও শেষ হইয়া আসে। আতপের ভাত, একটু ঘি, উচ্ছে কিণ্বা কলা সেক ইহাই প্রশান্ত বাবুর খাদ্য। অশোক মনে মনে নিজেদের খাওয়ার কথা ভাবে—৫৬টা ব্যঞ্জন ছাড়া তাহাদের বাড়ীর চাকরদেরও খাওয়া হয় না। রাত্রে শুধু পানিকটা ছুধ ছাড়া তিনি আর কিছু খান না। অশোক ভাবিয়া অবাক হয়, এত অল্প আহারেও প্রশান্ত বাবুর শরীর এমন সুদৃঢ় থাকে কেমন করিয়া। তাঁহার সহিত তাহাদের পরিচয় অনেকদিনের হইল—এই স্বদীর্ঘ কালের মধ্যে কোন দিন তাহারা প্রশান্ত বাবুকে পীড়িত দেখে নাই।

আহারের পর একটু বিশ্রাম করিয়া তিনি অশোককে পড়ান। যেদিন অশোকের সঙ্গে বই না থাকে সেদিন তাহার সঙ্গে নানারকম গল্প করেন। অতীতকালের মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তুর কাহিনী শুনিতে অশোকের বড়ই আগ্রহ। প্রশান্ত বাবু তাহার মনের এই কোতূহলের খবর রাখেন। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে শূন্যে ভাসমান নীহারিকা শ্রেণীর মধ্যে একটা আবর্ত হইতে কেমন করিয়া সূর্য্য এবং তাহা হইতে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলির সৃষ্টি হইল তাহা সে তন্ময় হইয়া শোনে। সৃষ্টির কালে পৃথিবী ছিল একটা উত্তপ্ত বাষ্পময় গোলা। তারপর ধীরে ধীরে সে কঠিন হইয়া আসিল, তখন তাহার বক্ষে দেখা দিল—মহাসমুদ্র, অঙ্গর চুস্বী পর্ব্বত, তাহার স্থনীল আকাশে দেখা গেল চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ ও অগণিত নক্ষত্র। তখনও আসে নাই পৃথিবীতে জীবনের কোন চিহ্ন—ঝড়-ঝঞ্ঝার আর্তনাদ ও অবিজ্ঞান বৃষ্টিপাতের শব্দে সেদিনের পৃথিবী রহিত মুখর। ধীরে ধীরে পৃথিবীতে দেখা গেল জীবনের চিহ্ন,—প্রথমে আসিল মৎস্য, সরীসৃপ ও অতিকায় কদাকার স্তন্যপায়ী জন্তুর দল। অতীত যুগের ডাইনোসেরাস, প্লেসিওসেরাস, টারোড্যাকটিল্‌স্, ম্যামথ প্রভৃতির রোমাঞ্চকর বিবরণ সে অত্যন্ত মন দিয়া শোনে। ইহারও

বহুকাল পরে নর-বানরের যুগ পার হইয়া আসিল, ধরণীর কনিষ্ঠতম সন্তান আমমাংসভোজী, প্রস্তুতায়ুধধারী মাক্ষুষের যুগ। মাক্ষুষ আস্তে আস্তে কেমন করিয়া সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার বিচিহ্ন কাহিনী তাহার মনে তীব্র অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া তোলে। ঈজিপ্ট, বাবিলন, আসিরীয়া, গ্রীক, রোম, পারস্য, চীন ও ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস তাহাকে কল্পনার কোন লোকে লইয়া যায়। এই সব কথা সংক্ষেপে শুনিয়া তাহার মনে তৃপ্তি হয় না। তাহার মনে হয়, কাকাবাবু আরও বড় করিয়া এই সব বলেন না কেন? কাকাবাবু যে সব বই পড়িয়া এত সব শিখিয়াছেন, সেই সব বইএর নাম তাহাকে জানিয়া লইতে হইবে—বড় হইয়া ইহার একটা বইও সে পড়িতে ছাড়িবে না। নানা কথায় গ্রীষ্মের ছপ্পুরগুলি কাটিয়া যায়, বেলা পড়িয়া আসিলে সে বাড়ীর দিকে রওনা হয়। রণভাঙ্গার মাঠ পার হইবার সময় অনেক দিন কিরণবাবুর সঙ্গে তাহার দেখা হয়। সন্ধ্যার দিকে প্রশান্ত বাবুর সঙ্গে একবার দেখা না করিয়া তিনি শান্তি পান না।

আষাঢ়ের প্রথমেই অশোকের জন্মদিন, প্রতিবৎসর এইদিনে কিরণ বাবু ও তাহার স্ত্রী দরিদ্রদিগকে আহার করান এবং বস্ত্র দান করেন। গ্রামের ভদ্রলোকদেরও ভোজ দেওয়া হয়। অশোকের জন্মদিনে সাধন-ভজনের সময়টুকু ছাড়া প্রশান্তবাবু বনতুলসীতেই রহিলেন। কুঠাতে ফিরিয়া যাইবার সময় প্রশান্তবাবু অনেকগুলি বই উপহার দিয়া গেলেন। বইগুলির মধ্যে ছিল, স্মাইল্‌সের সেল্‌ফ্‌ হেল্প ও ক্যারেকটার, ব্লাকির সেল্‌ফ্‌ কালচার; বড় বড় আবিষ্কারকদের কথা; রামায়ণ ও মহাভারতের একখানা করিয়া শিশু-সংস্করণ; ভণ্ডিযোগ; রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী; জীবজন্তুর কথা; গ্রহ-নক্ষত্র ও একখানা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চরিত। আত্মীয়-স্বজন সকলেই জন্মদিনে অশোককে নানারূপ উপহার দিয়াছে। কিন্তু অশোকের সব

চেয়ে ভাল লাগিল কাকাবাবুর দেওয়া বইগুলি। ইংরাজী বইগুলি সে আর একটু বড় হইয়া পড়িবে ঠিক করিয়া রাখিয়া, বাঙ্গলা বইগুলি আগেই পড়িয়া ফেলিল। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীখানা সে পড়িল চারিবার,—জনহিতের জন্ত উৎসর্গ করা কি সুন্দর জীবন! বইয়ের ঘটনাগুলি তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সেও কি চেষ্টা করিলে, এমন নিম্মল জীবন যাপন করিতে পারে না!

গ্রীষ্মের ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ছুটির পরে সে যথারীতি হোষ্টেলে প্রত্যাবর্তন করিল।

(১৩)

ধীরে ধীরে সদরের স্কুলে অশোকের তিন বৎসর কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে সকল বিষয়ে ফাষ্ট হইয়া সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইল। এই তিন বৎসরে তাহার দেহ ও মন যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করিল। ১৪।১৫ বৎসরের কিশোর অশোকের স্বগঠিত দীর্ঘ দেহ দেখিয়া অনেকেই তাহাকে ১৮।১৯ বৎসরের যুবক বলিয়া ভুল করিত। যেমন দেহের দিকে, তেমনি মনের দিকেও সে সমপাঠীদের মধ্যে ‘গালিভার’ হইয়া উঠিল। স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে, মেরিডিথ, জর্জ ইলিয়ট, কীপলিং, ওয়েলস্ প্রভৃতি আধুনিক ও প্রাচীন লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী সে পড়িয়া ফেলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সে একনিষ্ঠ ভক্ত,—চয়নিকার অধিকাংশ কবিতা সে অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারে। গ্রীস, রোম, স্পেন ও ইংলণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু পুস্তকও সে অধ্যয়ন করিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে সে এমন অনেক তথ্য জানে, যাহা একমাত্র ইতিহাসের বড় বড় অধ্যাপকদেরই

জানিবার কথা। হেডমাষ্টার মহাশয় তাহাকে ছেলের মত ভালবাসেন। সহপাঠীরাও তাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। বয়স ও জ্ঞান বাড়িলেও কাকাবাবুর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা কমে নাই। নিজের জ্ঞান বুদ্ধি পাওয়ায় আজ তাহার ভাল করিয়া বুঝিবার স্বযোগ হইয়াছে, কাকাবাবুর পাণ্ডিত্য কত গভীর! তবে কাকাবাবুর মত বিদ্বান হইব ইহা অশোকের কাম্য হইলেও, লোক চক্ষুর অন্তরালে এই যে জীবন-যাপন ইহা যেন অশোকের সব সময় ভাল লাগে না। কাকাবাবুর ধর্মজীবন সম্বন্ধে আজকাল তাহার কিছু ধারণা হইয়াছে,— তিনি যোগের পথে অগ্রসর হইতেছেন। অশোক ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, ইহা হইতে তিনি কি আনন্দ পান! এক একবার সে ভাবে কাকাবাবু এপথে না আসিলে দেশের ও দশের অনেক উপকার হইত। আবার পরক্ষণেই সে ভাবে কাকাবাবু জীবনে যে আঘাত পাইয়াছেন তাহা ভুলিবার জন্মই হয়ত, তিনি এপথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার কাঁধের সমালোচনা মনে মনে করাও তাহার পক্ষে অগ্নায়। কাকাবাবুর হিতাহিত জ্ঞান মননশীলতা তাহার অপেক্ষা কম নিশ্চয়ই নহে। কাকাবাবু যে ধর্মপথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অশোক বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, অত্যন্ত রুদ্ধ সাধন সত্ত্বেও, দিন দিন তাহার দৃষ্টি অত্যন্ত জ্যোতির্ময় ও দেহ কান্তিময় হইয়া উঠিতেছে।

সে যাহা হউক, অশোক এপথে যাইতে চায় না। পৃথিবীর অভাব-অভিযোগ তাহার মনকে অত্যন্ত নাড়া দেয়। সে চায় মানুষ্যের সেবা করিতে। লেখা পড়া শেষ করিয়া তাহার ইচ্ছা জনসেবার কাজে সে নিজেকে বিলাইয়া দিবে। বিবেকানন্দের জীবনী ও রচনাবলী সে বার বার পড়ে ও মনে মনে আবৃত্তি করে। “বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ দৈশ্বর!” ইহাই হইবে তাহার জীবনের মূলমন্ত্র,

আর জনসেবার ক্ষেত্রে স্বামীজীই হইবেন তাহার গুরু—ইহা সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।

স্কুলে আসার পর হইতেই জনসেবার কাজে তাহার আনন্দের আর সীমা নাই। সে যখন খার্ড ক্লাসে পড়ে তখন একটা ডুবন্ত ছেলেকে পুকুর হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল। এজ্ঞা রয়েল হিউম্যানিটেরিয়ান্ সোসাইটী তাহাকে একটা পদক দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। সহরে আগুন লাগিলে, মহামারী লাগিলে সর্বদাই সাহায্যকারীদের পুরোভাগে দেখা যায় অশোককে। হাততালি অথবা বাহবার লোভে নয়,—এইসব কাজ করিয়া সে অত্যন্ত আনন্দ পায়। হরিসাধন ছিল এইসব কাজে তাহার অগ্রতম সঙ্গী ও উৎসাহদাতা। সেও অশোকের মত আদর্শবাদী। অশোকের সঙ্গে হরিসাধনের পার্থক্য এই যে, অশোক বড় বেশী ভাবপ্রবণ, হরিসাধন ঠিক তাহা নয়। প্রায় চারি বৎসর একত্র ঘনিষ্ঠভাবে বাসের পর তাহাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে তাহারা বড় কষ্ট বোধ করিত। ফাষ্ট ক্লাসে গরমের ছুটির পর হইতে তাহারা পরস্পরের সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত হইল। অশোক ইহাতে অন্তরে গভীর আঘাত পাইল। বাপারটা এই যে,—

সে বৎসর গরমের ছুটিতে বাড়ী গিয়া হরিসাধন দেখিল, তাহার মা সঙ্কটাপন্নরূপে পীড়িত। রোগ উপেক্ষায় আরও বাড়িয়া গিয়াছে। পয়সা না পাওয়ায় ডাক্তার আসিতে চায় না, পথ্য কিনিবারও পয়সা এ কয়দিন জুটে নাই। হরিসাধন সাধ্য সাধনা করিয়া ডাক্তারকে একবার বাড়ীতে লইয়া আসিল। হাতুড়ে ডাক্তার—সেও এক টাকা ভিজিটের কমে রোগী দেখিতে না। তাহা ছাড়া ওষুধের দাম তাহার নগদ চাই। হরিসাধন তিন দিন পরে আবার এক বিপদ আসিয়া জুটিল। হরিসাধনের মায়ের মামার বাড়ীর গ্রামের এক

বৃদ্ধ লোক আসিলেন, হরিসাধনের বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া। হরিসাধনের মা আর এই লোকটির কণ্ঠা ছিল বালাসখী। হরিসাধনের মা, ইহার একটা কণ্ঠা জন্মিলে নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, উহাকে তাঁহার পুত্রবধু করিবেন। বৃদ্ধের কণ্ঠাটা মারা গিয়াছে, দৌহিত্রীটা ঠাচিয়া আছে। তিনিই তাহার অভিভাবক। হরিসাধনের মা-র পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন, পাছে মায়ের মৃত্যুর পর ছেলে বিবাহ করিতে নারাজী হয়! বৃদ্ধ হরিসাধনের মাকে হরিসাধনের বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, নগদ কিছু দিবেন এবং চটকলে ছেলের চাকরী করিয়া দিবেন। হরিসাধনের মা-র কেমন মনে হইল, তিনি আর বাঁচিবেন না। কষ্ট করিয়া ছেলে মানুষ করিয়াছেন, মৃত্যুর পূর্বে পুত্রবধুর মূখ দেগিয়া যাইতে পারিলে সুখে মরিতে পারিবেন। ডাক্তার-মুদী জমিদার-মহাজন সকলেই কিছু কিছু প্রাইবে,—অসুখের সময় তাহারা সকলেই তাগাদা আরম্ভ করিয়াছে। এ সময় নগদ কিছু পাইলে ঋণের জালা হইতে মুক্তিও পাওয়া যায় এবং মায়ের মনোভাব বুঝিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হরিসাধন বিবাহ করিতে রাজী হইল। হরিসাধনের মনে হইল, মা জীবনে কোন দিন সুখ পাইলেন না, আজ তাহার বিবাহ দিয়া যদি তাঁহার সুখ হয়, তবে সে তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবে না। যথাসম্ভব দিনা আড়ম্বরে দুই তিন দিনের মধ্যে হরিসাধনের সহিত বৃদ্ধের একাদশ বর্ষীয়া দৌহিত্রীর বিবাহ হইয়া গেল। মেয়েটির নাম বনলতা। বনলতার রয়স অল্প হইলেও তাহার স্বাস্থ্য-শ্রীর অভাব ছিল না। হরিসাধনের মা বৌ দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। বিবাহের দুই তিন দিন পরই হরিসাধনের মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বাড়ীতে আসার পর হইতে হরিসাধন তাহার মায়ের অসুখ, হঠাৎ বিবাহ ইত্যাদির জন্য অশোককে কিছু লিখিতে পারে নাই।

তাহার মায়ের মৃত্যুর পর অশোককে সে বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি লিখিয়া সব কথা জানাইল।

হরিসাধনের চিঠি পাইয়া অশোক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। অর্থের প্রয়োজনই যে হরিসাধনের বিবাহের অন্ততম কারণ—ইহাই তাহাকে বেদনা দিতে লাগিল। অর্থ, সে কি হরিসাধনকে সাহায্য করিতে পারে না? অনায়াসে পারে, কিন্তু হরিসাধন তাহা লইতে চাহে না, তাহার আত্ম-মধ্যাদাজ্ঞান অত্যন্ত তীব্র। তাহা ছাড়া সে বলে অশোক নিজে উপার্জন করে না, কাজেই, তাহার দান সে গ্রহণ করিতে পারে না। গরমের ছুটির পর স্কুল খুলিলে অশোক আশা করিয়াছিল, হরিসাধন যথারীতি স্কুলে যোগদান করিবে। স্কুল খোলার পর দিন পনের কাটিয়া গেল, তবুও হরিসাধনের দেখা পাওয়া গেল না। শেষে ওই অঞ্চলের একজন লোকের নিকট অশোক সংবাদ পাইল, হরিসাধন আর পড়িবে না। সে কলিকাতায় চাকরী করিতে গিয়াছে। তাহার মামাশুশুর তাহাকে চাকরীটা জোগাড় করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, চাকরীর জন্তই লেখাপড়া। সেই চাকরীই যদি পাওয়া যায়, তবে আর লেখাপড়ার দরকার কি! তাহা ছাড়া তাহার প্রত্যক্ষ দেখা আছে যে, লক্ষ লক্ষ বি-এ, এম-এ, এই সব চাকরী পাইবার জন্তই হা-হতাশ করিয়া মরিতেছে।

সংবাদটা শুনিয়া অশোক মনে বড় ব্যথা পাইল। তারপর হরিসাধনের ভবিষ্যৎকে নিজের ভবিষ্যতের পাশে রাখিয়া সে অনেক বিচার করিল। সাধন লেখা-পড়া ছাড়িয়া ভাল করিল কি? এইরূপ একটা প্রশ্ন তাহার মনের মধ্যে নিয়ত উদ্ভিত হইতে লাগিল। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, তাহাকে পেছনে ফেলিয়া রাখিয়া বাকী সকলে যেমন তীর্থের দিকে আগাইয়া চলে, তাহাদের আর সব সহপাঠীরাও সেইরূপ পড়াশুনা করিয়া যাইতে

লাগিল। অশোকের সর্বদাই মনে হইতে লাগিল, হরিসাধন তাহার উজ্জল ভবিষ্যতের মূলে কুঠারাঘাত করিল। চারি বৎসর একত্র বাসের ফলে অশোক হরিসাধনের প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম প্রথম তাহার অভাবটা তাহাকে খুবই পীড়া দিতে লাগিল। নূতন বয়স, নূতন নূতন বন্ধুর দল পাওয়ায়, কয়েক মাসের মধ্যেই তাহার মন আবার ঠিক হইয়া গেল। হরিসাধনের জ্ঞান আর মন খারাপ হইত না। শুধু তাহার মনে হইত, মধ্যে মধ্যে সে পত্র লিখিয়া জানায় না কেন, সে কেমন আছে।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল। পূজার ছুটিতে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শুধু অশোক বাড়ী গেল—কাকাবাবুর নিকট পড়াশুনায় যথেষ্ট সাহায্য পাইবার আশায়। ছুটির মাসটা ভাল করিয়া সে পড়িল। এই কয়েক মাস বাহিরের বই-ই সে পড়িয়াছিল, পাঠ্যপুস্তক ভাল পড়া হয় নাই। ছুটি শেষ হইলে সে আবার হোষ্টেলে আসিয়া টেবিল দিল। তাহার টেবিলের ফল বেশ ভালই হইল।

টেবিলের পর তিন মাস তাহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।—ম্যাট্রিকের ফল বাহির হইলে দেখা গেল, অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। অশোকের সাফল্য স্কুলের শিক্ষক হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের বাড়ীর ঝি-চাকর পর্যন্ত অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সব চেয়ে বেশী আনন্দিত হইলেন প্রশান্তবাবু।

যে কলেজে কিরণবাবু পড়িয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল অশোককে ঐ কলেজেই ভর্তি করেন। প্রশান্ত বাবুরও তাহাই মত। একটা ভাল দিন দেখিয়া কিরণ বাবু অশোককে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন। কিরণবাবুর সময়ের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের কেহ কেহ তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁহারা অশোককে বিশেষ স্নেহ ও

আনন্দের সহিত কলেজে গ্রহণ করিলেন। ভাল ভাল ছেলেরা সাধারণতঃ সরকারী কলেজে ভিড় করে। কিন্তু দুই একটা ভাল ছেলে ছিটকাইয়া অগ্র কলেজে গেলে সেখানে তাহারা অত্যন্ত সমাদর পাইয়া থাকে। কলেজ হইতেও অনেকগুলি বৃত্তি এবং স্কলার হিসাবে ফ্রী-ষ্টুডেন্টশিপ তাহার লাভ হইল। মিশনরী পরিচালিত একটা ভাল ছাত্রাবাসে অশোকের থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কিরণবাবু বাড়ী চলিয়া গেলেন।

(১৪)

প্রথম কয়দিন অশোকের কলিকাতায় অত্যন্ত বিস্তী বোধ হইতে লাগিল। চারি বৎসর আগে বনতুলসীর মাইনর স্কুল হইতে জিলা স্কুলে পড়িতে আসিবার সময় তাহার মনের অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল। দিন কয়েকের মধ্যেই তাহার মনের এ অবস্থাটা কাটিয়া গেল। তাহার বাবা যে কয়দিন কলিকাতায় ছিলেন সে কয়দিন সে তাহার সঙ্গে সঙ্গে খুবই ঘুরিয়াছিল। এই কয়দিনেই পথ-ঘাট মোটামুটি সে চিনিয়া ফেলিয়াছিল। কলেজের ছুটির দিনে সে যাহুঘর, আলিপুর জু, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল প্রভৃতি দেখিতে যাইত। সন্ধ্যা বেলায় গঙ্গার ধারে ধারে বেড়ান তাহার একটা আকর্ষণ হইয়া উঠিল।

কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা ভাল ছেলে হিসাবে তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। অনেক অধ্যাপকই ক্লাস শেষ হইলে পড়াশুনা সম্বন্ধে তাহাকে ডাকিয়া নানা উপদেশ দিতেন। কলেজের বহু সহ-পাঠীর সঙ্গেও তাহার আলাপ হইল। ইহার মধ্যে একটা ছেলের সঙ্গে তাহার শীঘ্রই বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল। ছেলেটির নাম অমিতাভ সেন। কলিকাতাতেই তাহাদের নিজেদের বাড়ী। কলিকাতার

এক স্থল হইতে সেও পনর টাকার বৃত্তি পাইয়া এই কলেজে পড়িতে আসিয়াছে। খাস কলিকাতার ছেলেদিগকে অশোকের বড় ভাল লাগিত না, অমিতাভকে কিন্তু তাহার বড়ই ভাল লাগিল। কিছু দিনের মধ্যেই অমিতাভ অশোকের ভ্রমণের নিত্য সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। অশোক তাহার সহিত আলাপ-আলোচনায় বৃন্নি, এই ছেলেটীও তাহারই মত আদর্শবাদী। এক প্রকৃতির মানুষদের মনের মিল হইতে দেবী হয় না। মাসখানেকের ভিতরেই তাহাদের পরিচয়টা এত জমাট হইয়া উঠিল যেন তাহারা দুইজনে কতদিনের পুরাতন বন্ধু! উভয়ের মধ্যে নিজেদের পরিবার, অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন-সম্বন্ধে অনেক সময় কথা হইত। অশোকের নিকট হইতে অমিতাভ যে সব কথা শুনিয়াছিল তাহার মধ্যে প্রশান্তবাবুর কথাও ছিল। অমিতাভ যে বিবাহিত একথা তাহার সহিত আলাপের কিছুদিন পরই অশোক জানিতে পারিয়াছিল। অমিতাভের বাপ-মা দুই-ই তাহার বাল্যকালে মারা যান। অমিতাভের দিদিই তাহাকে বাল্যকাল হইতে মানুষ করিয়াছেন। তিনিই তাঁহার একমাত্র অভিভাবিকা। অশোক অমিতাভের নিকট তাহার দিদির সম্বন্ধে বহু কথাই শুনিয়াছে। অমিতাভের বাবা ঝাঁচিয়া থাকিতেই দিদির স্বামী একটা ছেলে রাখিয়া মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার ছেলেটীও মারা যায়। স্বামী মারা যাওয়ার পর হইতে স্বস্তুর বাড়ীতে তাঁহার উপর অকথা নির্ঘাতন চলিতে থাকে। এই সংবাদ পাইয়া অমিতাভের বাবা দিদিকে বাড়ী লইয়া আসেন। সেখানে আর তাঁহাকে যাইতে দেন নাই। অমিতাভদের অবস্থা বেশ ভাল নহে। কলিকাতার বাড়ীখানা তাহাদের নিজের। নীচের তলার দুখানা ঘর এক হিন্দুস্থানী মুদীকে ভাড়া দেওয়ায়, মাসে টাকা পঁচিশেক পাওয়া যায়। অমিতাভ এক বেলা টিউশানি করিয়া

টাকা পনের পায়। পড়ার খরচটা অমিতাভর বৃত্তি পাওয়ার জন্ত লাগে না।

সেদিন রবিবার। অমিতাভ অশোককে নিমন্ত্রণ করিল। ইহার আগে অশোক আর কখনও অমিতাভদের বাড়ী আসে নাই। উত্তর কলিকাতায় এক গলির মধ্যে একখানা ছোট্ট দোতানা বাড়ী। উহার ছোট বড় সবুজ চারিখানি ঘর উপর তলায়। একটা রান্নাঘর, একটা পূজার ঘর, একটায় থাকেন দিদি নিজে, আর একটায় থাকে অমিতাভ ও তার স্ত্রী। একলা থাকিতে দিদির অত্যন্ত কষ্ট হওয়ায় দিদির আগ্রহাতিশয্যেই অমিতাভ বিবাহ করিয়াছে। বোটা কলিকাতারই মেয়ে, বয়স তাহার অল্প।

অমিতাভদের বাড়ীতে আসিতেই অশোকের প্রথমে দেখা হইল দিদির সঙ্গে। অমিতাভ কোথায় বাহিরে গিয়াছিল। অশোক দেখিয়াই বুঝিল—ইনি দিদি। দিদিকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বসাইয়া বলিলেন, “অমিতাভর কাছে দিনরাত তোমার কথা শুনি। এতদিন দিদিকে দেখতে আসনি কেন ভাই?” দিদিকে দেখিয়া অশোকের মনে অত্যন্ত আশ্চর্য উদয় হইল। দিদির সমস্ত মুখে একটা সস্মিত শ্রী বিরাজ করিতেছে। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয়, মনখানি অত্যন্ত উদার। বাজার হইতে কয়টা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনিয়া অমিতাভ বাড়ী আসিয়া দেখিল, দিদি ও অশোক কাছাকাছি বসিয়া দিব্য কথা-বার্তা করিতেছেন, যেন কতকালের জানাশুনা। বাড়ীতে না থাকার জন্ত তাহার যেটুকু লজ্জা হইয়াছিল—এই দৃশ্য দেখিয়া তাহা চলিয়া গেল। সে বাড়ীতে ছিল না বলিয়া যে, অশোকের আদর-অভ্যর্থনায় কোন ক্রটি হয় নাই, ইহাতে তাহার বেশ আনন্দই হইল।

দিদির সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপের পরই অশোক বুঝিল,—তিনি

স্বশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী নারী। সন্ধ্যা হইলে দিদি স্নান করিতে গেলেন—তাহার আফিকের সময় হইয়াছে। অমিতাভর বৌকে চা আনিতে বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। অমিতাভ তাহাকে লইয়া পাশের ঘরে গেল—এটা তাহাদের ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে ঘরখানি। ঘরের একপাশে একটা টেবিল, দুধারে দুখানা চেয়ার, টেবিলের উপর পাঠ্য ও অপাঠ্য বহু বই গোছান। এটা অমিতাভর পাঠ-কক্ষও বটে। অমিতাভ ও অশোক ঘরে আসিয়া বসিতেই একটা হাস্তমুখী তরুণী চা ও জলখাবার লইয়া আসিল। অশোক নিয়মিত চা খায় না। অমিতাভ ও তাহার স্ত্রীর অনুরোধে কাপটা সে তুলিয়া লইল। চা খাওয়া শেষ হইলে অমিতাভর বৌ আবার রান্নাঘরে ফিরিয়া গেল। শাস্ত্র অথচ সপ্রতিভ এই মেয়েটাকে অশোকের প্রথম দৃষ্টিতেই বেশ ভাল লাগিল। অমিতাভ ইত্যবসরে আলমারী খুলিয়া অশোককে তাহার স্ত্রীর শিল্প-কাব্য, তাহার স্কুলে পুড়িবার সময়কার পাওয়া প্রাইজ ও মেডেল প্রভৃতি দেখাইতে লাগিল। তাহার স্ত্রী যে শুধু সুন্দরী নয় বেশ মার্জিতরুচিরও, ইহা লোকের কাছে জানাইতে পারিলে তাহার অত্যন্ত আনন্দ হয়—ইহা অশোক বেশ বুঝিতে পারিল। কাজেই, ভদ্রতার অনুরোধে সে এই সবেল প্রশংসা করিতেই অমিতাভ বলিল, “বুঝলে অশোক বৌ গানও বেশ ভাল গায়। দিদি যেদিন কালীঘাট যাবেন সেদিন তোমায় ডেকে আন্বো শুনে যেয়ো। ‘লেখা’ বড্ড ‘শাই’ কিনা তার উপর দিদি গুরুজন, তাই তার কাছে ও মোটেই গান গাইতে চায় না। ও, “যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল”, যা গায়, একেবারে মারহেল্লাস!” অশোক শুনিয়া বলিল, সে তাহার বৌএর গান শুনিতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। স্বযোগ পাইলেই অমিতাভ যেন তাহাকে ডাকিয়া আনে। রান্নাঘর হইতে লেখা তাহার স্বামীর কথা

সব শুনিতেছিল। স্বামীর কথায় তাহার লজ্জা এবং কৌতূহল দুই-ই হইতেছিল। আহা! বেচারী এতদিনে স্ত্রীর গল্প করিবার লোক পাইয়াছে, ভালো!

রাত্রে আহারের পর অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া অশোক হোষ্টেলে ফিরিল। আসিবার সময় দিদিকে এবং লেখাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইল যে, সময় পাইলে সে এখানে আসিবে। অনেকদিন পরে পারিবারিক জীবনের আশ্বাদ পাইয়া অশোকের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। এখন হইতে সে ভাবিতে পারে যে, কলিকাতায় সে নির্বাসিত নহে। সেইদিন হইতে সে প্রায়ই অমিতাভর সঙ্গে তাহাদের বাড়ী যাইত। এক সঙ্গে কয়দিন না গেলেই দিদি ডাকিয়া পাঠাইতেন। তাঁহার স্নেহের আহ্বান উপেক্ষা করিবার ইচ্ছা অশোকের হইত না। দেখিতে দেখিতে প্রথম বৎসরটা অশোকের বেশ কাটিয়া গেল।

(১৫)

সেকেণ্ড ইয়ারের প্রথম দিকে কলেজ খুলিতেই সংবাদ পাওয়া গেল,—উত্তরবঙ্গে ভীষণ বন্যা আরম্ভ হইয়াছে। বহুলোক মারা গিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক বিপন্ন। ঐ অঞ্চলে রেল লাইন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ট্রেন চলাচলও কয়েকদিন হইতে বন্ধ আছে। রামকৃষ্ণ মিশন, কংগ্রেস প্রভৃতি সংবাদ পাওয়া মাত্রই স্বেচ্ছাসেবক লইয়া সাহায্যের জন্ত ছুটিল। দেশবিখ্যাত বুদ্ধ আচার্য্যের আহ্বানে যে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠিত হইল, অশোক সেই দলে গিয়া যোগদান করিল। এসব কাজে সে চিরকালই অগ্রণী। বস্ত্র-আহার্য্য ঔষধ প্রভৃতি লইয়া বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে গিয়া সে দেখিল, এক মর্মান্বদ দৃশ্য! জল—জল চারিদিকে শুধু জল। জল

ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। লোকের বাড়ী-ঘর, হাট-বাজার শস্তক্ষেত্র সমস্তই বন্যায় গ্রাস করিয়াছে। যেখানে সামান্য একটু স্থল সেইখানে গৃহহীন-বস্ত্রহীন-বুড়ুসু নরনারীর দল আশ্রয় লইয়াছে। জলের স্রোতে বহুলোকের ও পশুর মৃতদেহ, ঘরের চালা প্রভৃতি ভাসিয়া যাইতে দেখা গেল। বন্যা যে সব স্থান অধিকার করে নাই সেই সব স্থানে টিনের অস্থায়ী শেড্ নির্মাণ করিয়া লোকদের আশ্রয় দেওয়া হইতে লাগিল। কিছু দূর দূর ক্যাম্প খুলিয়া স্বৈচ্ছাসেবকেরা নৌকায় করিয়া কাপড়-চোপড় ও খাতি বিতরণ করিতে লাগিল। বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের নরনারীর মুখে যে ভয়ান্ত ও অসহায় ভাব সে দেখিল তাহার আর তুলনা নাই। বন্যার বেগ প্রশমিত হইতে না হইতে দেখা দিল—কলেরা,—বেনোজল পানের জন্ম। কলেরা রোগীতে অস্থায়ী ক্যাম্প-হাসপাতালগুলি ভরিয়া উঠিতে লাগিল। দিন নাই, রাত্রি নাই, অশোক এই সব রোগীর সেবা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার এই পরিশ্রমের ক্ষমতা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া উঠিল। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এমন করিয়া লোকের সেবা যে করিতে পারে, সে কি মানুষ! অশোক নিজেই এক এক সময় বিস্মিত হইত যে, এত পরিশ্রম সে করিতেছে কি করিয়া! তাহার যে এত পরিশ্রম করার ক্ষমতা আছে, এখানে আসিবার পূর্বে সে নিজেই তাহা জানিত না। সেবাধর্ম্মে তাহার অপূর্ব নিষ্ঠা দেখিয়া বৃদ্ধ-আচার্য্য একদিন উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—“তোদের মত একদল ছেলে রেখে নিশ্চিন্ত মরতে পারব। বুঝতে পারছি, তোরা বেঁচে থাকতে বাঙ্গলা দেশের হতভাগা মানুষগুলোর বিপদে বন্ধুর অভাব হবে না।”

বড় বড় কাগজে ছাত্র স্বৈচ্ছাসেবকদের বিশেষতঃ ছাত্রনেতা

অশোক কুমার চৌধুরীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাহির হইতে লাগিল। কোন কোন কাগজে তাহার ফটোও ছাপা হইয়া গেল।

দুই মাসেরও অধিককাল অশোকদের ক্যাম্পে থাকিতে হইল। বন্ধার প্রকোপ কমিলে লোকদের ঘর-বাড়ী বাধার উত্তোগ-পর্ক শেষ করিয়া দিয়া তাহারা কলিকাতায় ফিরিল। কলিকাতায় আসিয়াই সে অমিতাভদের বাড়ী গেল। দিদি তাহাকে দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। অশোকের কীর্ত্তি-কলাপ কাগজে সবই তাঁহার পড়িয়াছিলেন। নিজের শরীরের প্রতি অবহেলা করার জন্ত দিদি একটু মুহু ভৎসনাও করিলেন। কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পরই পূজার ছুটি আরম্ভ হইল—পূজার ছুটিতে অশোক বাড়ী আসিল।

পূজার ছুটির পর কলেজ খুলিয়াছে, সন্ধ্যার দিকে অশোক কি একটা কাজে শিয়ালদার দিকে গিয়াছিল। ফিরিবার পথে ফুটপাথ দিয়া চলিবার সময় হঠাৎ একটা লোককে দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। আরে এ যে—হরিসাধন! মুখের ভাবটা দেখিয়া সে চিনিল বটে, শরীর দেখিয়া কিন্তু তাহাকে চিনিবার উপায় ছিল না,—শরীর তাহার এতই জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া সে হরিসাধনের অনেক খোঁজ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পায় নাই। একজন পুরাতন বন্ধুকে সে ভুলিতে বসিয়াছে, এটা খচ্ খচ্ করিয়া তাহার বৃকে কাঁটার মত বিধিত। তাই হঠাৎ এভাবে হরিসাধনের দেখা পাইয়া সে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। হরিসাধনের অত্যন্ত আনন্দ হইল অশোকেব দেখা পাইয়া। অশোক তাহাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “তারপর সাধনদা, কেমন আছ? আমাদের কাছ থেকে এমন ডুব দিয়েছ যে, কোন খবর রাখারও উপায় রাখ নি।” হরিসাধন স্নান হাসি

হাসিয়া বলিল,—“খবর রাখলেও খুসী হতে পারতিস্ না ভাই, অশোক। আমি নিজে কষ্ট পাচ্ছি এই টের, তোদের স্বচ্ছ কষ্ট দিয়ে আর কি লাভ বল্। তাছাড়া এখন তোদের পথ আর আমার পথ ত ভিন্ন। তোদের সামনে উজ্জল ভবিষ্যৎ, আর আমার সামনে বিরাট অন্ধকার! আমি প্রতীক্ষা করছি সেদিনের, যেদিনে আমার সকল কষ্টের অবসান হবে।” কুড়ি একুশ বছরের যুবকের মুখে জীবন এত বিস্বাদ কেন লাগে অশোক তাহা ভাল বুঝিল না। ফুটপাথে দাঁড়াইয়া অশোক হরিসাধনের বর্তমান জীবন সম্বন্ধে যে সংবাদ সংগ্রহ করিল তাহা এই,—বিবাহ করিবার পরেই হরিসাধনের মামা শম্ভুর এই সহরের উপকণ্ঠে এক চটকলে তাহার ১৫ টাক্ষা মাহিনার একটা চাকরী করিয়া দেন। বিবাহের এক বৎসর পরেই তাহার মামা শম্ভুর মারা যান। মামা শম্ভুর মারা যাইতেই তাহার স্ত্রীকে আর ওখানে রাখা সম্ভব হয় নাই। তাহার শালা একটা গাঁজাখোর অকর্মণ্য। তাহার স্ত্রীর উপরই সংসারের ভার। ও রকম দজ্জাল মেয়েমানুষ বড় একটা দেখা যায় না। ভ্রাতৃজায়ার অত্যাচারের জন্ত হরিসাধনকে বাসা করিতে হইয়াছে, তাহার স্ত্রীর জন্ত। উল্টাডিক্কীতে একটা বস্তির মধ্যে তাহার বাসা। হরিসাধনের শরীর কোনদিন ভাল নয়, উপযুক্ত খাদ্যাভাব তার উপর কলের অত্যন্ত পরিশ্রমে বছর দুই হইল তাহার হাঁপানি হইয়াছে, মাঝে মাঝে রোগে সে অত্যন্ত কষ্ট পায়। অশোককে এতগুলো কথা বলিয়া হরিসাধন খুব বেশী কাশিতে লাগিল। ছেঁড়া সাটের মধ্য দিয়া পাজরগুলি একটা দুইটা করিয়া গোনা যায়। কাশি কিছুতেই থামেনা দেখিয়া, অশোক একটা রিক্সা ডাকিল। তারপর তাহাকে রিক্সায় তুলিয়া তাহার বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া রিক্সাওয়ালাকে বলিল—“চালাও।” অশোক সঙ্গে চলিল। বস্তির মধ্যে নির্দিষ্ট ঠিকানায়

যখন সে পৌঁছিল, তখন অন্ধকারে, আবর্জ্ঞনায়, দুর্গন্ধে, চীৎকারে স্থানটা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। ঘটা-দুই আগে অশোক ধারণায়ও আনিতে পারে নাই যে, তাহার অতি পরিচিত কেহ এইরূপ স্থানে বাস করিতে পারে। অশোক হরিসাধনকে পরিয়া রিক্স হইতে নামাইতেই, বোধহয়, লোকজনের সাড়া পাইয়া বস্তির একধারে একখানা ঘরের দরজা খুলিয়া গেল,—দেখা গেল একটা বার তের বছরের মেয়ে উৎকণ্ঠিত চিতে একটা তেলের কুপী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অপেক্ষমানা মেয়েটা যে-ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল হরিসাধন সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেই অশোক বুঝিল,—এটাই হরিসাধনের স্ত্রী। ঘরে ঢুকিয়া অশোক হরিসাধনকে পরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। ঘরখানিতে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। এইরূপ আলো-বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিলে যদি রোগে ধরে তবে রোগকেও বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অশোককে দেখিয়া স্ত্রী বনলতা দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। হরিসাধন তাহার দিকে তাকাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল “অশোককে দেখে লজ্জা কি লতা? ওকে আমি ছোট ভাইয়ের মত দেখি।” ওর কথা ত তুমি আমার কাছে কত শুনেছ”, হরিসাধনের কথায় বনলতা মুখের ঘোমটা সরাইয়া দিল। অশোক দেখিল মেয়েটা সুন্দরী, কিন্তু বয়স এত কম যে, ইহাকে কাহারও বধূরূপে কল্পনা করিতে ভাল লাগে না। সহরের মেয়েরা যে বয়সে ফ্রক পরিয়া স্কীপিং করিয়া বেড়ায় সেই বয়সে এই মেয়েটির উপর সংসার চালানোর ভার যাহারা দিয়াছে তাহারা নিতান্ত অববেচক। তাহার উপর হরিসাধনের শরীরের যে অবস্থা ইহাতে কত দিন আর সে বাঁচিতে পারে। তার পর আমরণ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করা, একমুষ্টি অন্নের জন্ত কোন আত্মীয়ের গলগ্রহ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। হরিসাধন

অল্প একটু সুস্থ হইলে অশোক বলিল,—“সাধনদা, কাল সকালে আমি তোমাকে বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। আমার মনে হচ্ছে, আগাগোড়া অবহেলা করায় রোগটা তোমার বেড়ে গিয়েছে।”

হরিসাধন বলিল,—“সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, মাইনেও অত্যন্ত কম, কেমন করে চিকিৎসা করাব ভাই! প্রথম প্রথম কিছু খরচ করেছিলাম, তাতে যখন কোন ফল হলনা, তখন অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছি! তোমার কাছে সাহায্য নিতে কোন লজ্জা নেই ভাই। কিন্তু তুমি টাকা পাবে কোথায়?” অশোক উত্তর দিল, “সাধনদা,—আমি ২০ টাকা করে স্ফলারশিপ পাই, এ টাকাটা দিয়ে তোমার চিকিৎসা করাব। আমার সাহায্য নিতে যদি নেহাৎ অনিচ্ছুক হও তবে না হয় ধার বলেই নিও। বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে শোধ করতে পারবে।”

কৃতজ্ঞতায় হরিসাধনের চোখের কোণে জল দেখা দিল,—সে বলিল, “তুমি যা করতে চাও কর ভাই, আমার কিন্তু নিজের জীবনের প্রতি বিশেষ মমতা নেই। একটা বিয়ে করেছি বৌটার জন্তেই যা বাঁচার প্রয়োজন।”

অশোক উঠিল। বনলতা তাহাকে দরজা পর্যন্ত আলোটা দেখাইয়া দিতে আসিল। দরজার বাহিরে পা দিয়া সে বনলতাকে বলিল, “আপনি যান্, এবার বেশ যেতে পার্বো।” স্নান আলোকে অশোক দেখিতে পাইল, বালিকা স্কৃতজ্ঞ নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। সে চোখ নামাইয়া বলিল,—“কাল সকালে যেন আসবেন, আমাদের এ দুর্দিনে আর কেউ নেই।” অশোক বলিল যে সে নিশ্চয়ই আসিবে। রাত্রি অধিক হইয়াছিল, সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেননা, রাত্রি নটার পর হোষ্টেলের দরজা আর খোলা পাওয়া যাইবে না।

(১৬)

মাস তিনেক পরের কথা। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আর দিন পনের বাকী আছে। একদিন দুপুর বেলা আহারের পর অশোক পড়িতে বসিয়াছে, এমন সময় সে শুনিল, বারান্দায় একটা ছেলে যেন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—“অশোক বাবু, কোন ঘরে থাকেন, মশায়? অশোক চৌধুরী, বনতুলসীর অশোক বাবু।” অশোক বাহিরে আসিয়া দেখিল, ছেলেটিকে সে চেনে—হরিসাধনেরই প্রতিবেশী। কোন একটা ছাত্রের কারখানায় সে কাজ করে। ছেলেটা অশোককে নমস্কার করিয়া বলিল—“আপনি শিগগির একবার চলুন বাবু, হরিসাধন বাবুর অসুখটা সকাল থেকে খুব বেড়েছে।” তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরিয়া, পকেটে মনিব্যাগটা ফেলিয়া অশোক ছেলেটির অনুসরণ করিল। এই কয় মাস অশোক হরিসাধনের চিকিৎসার কোন ক্রটি করে নাই। কিন্তু দীর্ঘকালের অবজ্ঞাত রোগ ক্রমশঃ তাহাকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছিল। হরিসাধনের বাসায় পৌছিয়া অশোক দেখিল, তাহার প্রায় শেষ সময় উপস্থিত। যে ছেলেটা তাহাকে ডাকিতে গিয়াছিল তাহার হাতে সে একটা স্লিপ লিখিয়া তাহাকে ডাক্তারের নিকট পাঠাইল। অশোককে দেখিয়া অতিকষ্টে হরিসাধন বলিল,—“ভাই অশোক, তোমাকে বড় কষ্ট দিলাম,—আমার আর দেয়ী নাই ভাই। বনলতার কথা ভেবেই আমার মবুতে কষ্ট হচ্ছে। ওর হিতাহিতের ভার তোমার ওপরেই দিয়ে গেলাম, তুমি মহাপ্রাণ, যা ভাল হয় করো।” অশোক বলিল, “এসব তুমি কি ভাবছো সাধনদা, তুমি শীঘ্রি ভাল হয়ে উঠবে”—অশোকের কথা শেষ হইতে না হইতেই হরিসাধন মুখখানা যেন কিরূপ বিকৃত করিল, অশোক

বুঝিল এইবার শেষ। বনলতা এতক্ষণ হরিসাধনের পায়ের তলায় বসিয়াছিল, এইবার সে স্বামীর মৃতদেহের উপর বাঁপাইয়া পড়িল। তার পর কিছুক্ষণ অভাগিনী বালিকার যে শোকের অভিব্যক্তি সে দেখিল তাহা বলিবার নহে। কিছুক্ষণ পরেই ছেলেটা ডাক্তারকে লইয়া ফিরিল। ডাক্তার একবার মৃতদেহটা দেখিলেন, তারপর ডেথ্ সার্টিফিকেট লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। হরিসাধনের যখন মৃত্যু হইল তখন রাত্রি ৮টা। অশোক সেই ছেলেটাকে শবদেহের নিকটে বসাইয়া রাখিল। বনলতার উপরও একটু নজর রাখিতে বলিল। তার পর সে গেল তাহার জানা হোটেলগুলিতে শববহন করিবার লোকের জন্ম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লোকজন সংগ্রহ করিয়া সে বস্তিতে ফিরিয়া আসিল। হরিসাধনের শবদেহ পাটিয়ায় তুলিয়া অশোক ও অগ্র শববাহীরা শ্মশানের দিকে রওনা হইল। বনলতাকেও শ্মশানে যাইতে হইবে। তাহার জন্ম অশোক একটা গাড়ী ডাকিয়া দিল। গাড়ীতে বনলতার সঙ্গে চলিল, সেই ছাতার কারখানার ছেলেটা এবং বস্তীরই আর একটা মেয়ে। সন্ধ্য-বিধবার শোকের দৃশ্য দেখিয়া অশোকের মনে হইতে লাগিল, তাহার হৃৎপিণ্ডটা উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়া কে যেন বিদ্ধ করিয়া দিতেছে।

শেষ রাত্রে সংকার শেষ করিয়া অশোকরা আবার বস্তিতে ফিরিল। ঘরে ঢুকিয়া শূণ্যগৃহের মেঝেতে বনলতা আছড়াইয়া পড়িল। অশোকের মুখে সাঙ্ঘন্য আর কোন ভাষা জোগাইল না। সে শুধু বলিল, “তুমি ভেবোনা বনলতা, আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোন কষ্ট হবে না। আমাকে তুমি নিজের দাদা বলেই মনে করো, তুমি ত জানই সাধনদা আমাকে কত আত্মীয় বলে ভাবত।”

আন্তে আন্তে দুঃখের রজনী প্রভাত হইল। সকালে বস্তির স্রীপুরুষ সব আপন আপন কাজে বাহির হইয়া গেল। অশোক

ভাবিতে লাগিল, বনলতাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে। অনেক ভাবিয়া সে ঠিক করিল, বনলতাকে আপাততঃ কয়েকদিন দিদির বাড়ীতে রাখিয়া দিবে। তারপর সে যদি নিজের মামার বাড়ী যাইতে চায় তবে সে পরীক্ষার পর তাহাকে ওখানে রাখিয়া আসিবে। বনলতা একটু শান্ত হইলে অশোক সব কথা তাহাকে বুঝাইয়া বলিল। বনলতা পাড়গাঁয়ের মেয়ে হইলেও নির্বোধ নহে। তাহার জ্ঞান অশোকের পড়ার ক্ষতি হইতেছে, তাছাড়া স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাকে এখানে একা ফেলিয়া রাখিতে অশোক ইতস্ততঃ করিতেছে সে সব বুঝিতে বনলতার দেবী হইল না। সে বলিল, “আপনি যা বলবেন দাদা, তাই করব।” অশোক বলিল—ঘরের জিনিষ পত্রগুলি সব গুছাইয়া লইতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাদিতে কাদিতে বনলতা তাহাদের পাতানো সংসার ভাঙ্গিতে বসিল। দেড় বৎসর আগে কত আশা লইয়াই না সে এখানে বাসা বাঁধিয়াছিল। জিনিষপত্র গুছান শেষ হইলে অশোক একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়া জিনিষপত্রগুলি গাড়ীতে তুলিয়া দিল। হরিসাধনের ঘরের ভাড়া, খুচরা ধার সব সে লোক ডাকিয়া শোধ করিয়া দিল। শেষে সে ও বনলতা গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে উঠিয়া বনলতা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। গাড়ীর ঘর ঘর শব্দ ছাপাইয়া অশোকের কাণে আসিতে লাগিল সছো-বিধবা নারীর মর্মভেদী কান্না।

‘অমিতাভদের বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামিতেই দিদি নীচে নামিয়া আসিলেন। অশোকের ক্রম্ব চুল, লাল চোখ, চিন্তাপীড়িত মুখ এবং তাহার সঙ্গে একটা অশ্রুমুখী বালিকাকে দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। অশোকের নিকট হরিসাধনের কথা দিদি শুনিয়াছিলেন। সে যে বেশী দিন বাঁচিবে না—একথা অশোকের নিকট তিনি শুনিয়াছিলেন বলিয়াই আজ অশোক এবং মেয়েটাকে একসঙ্গে দেখিয়া

বুদ্ধিমতী দিদি অনুমানে সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়া লইলেন। দিদি এবং অমিতাভ কত উচ্চমনা তাহা অশোক জানে, এবং তাহা জানে বলিয়াই বিনা পরামর্শে সে বনলতাকে এভাবে এখানে আনিতে পারিয়াছে। দিদি বনলতাকে একরূপ কোলে করিয়া ওপরে লইয়া গেলেন। অশোককে বলিলেন—“তুমি যে ভাই বুদ্ধি করে ওকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ, এতে আমি বড় খুসী হয়েছি।” জিনিষপত্রগুলি নামাইয়া দিয়া গাড়োয়ানের ভাড়া মিটাইয়া দিয়া অশোকও উপরে গেল। অমিতাভও তখন বাড়ীতে ছিল, তাহাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া সে বলিল—আর দুই সপ্তাহ পরেই তাহার পরীক্ষা। পরীক্ষার ক’দিন বনলতা তাহাদের বাড়ীতে থাকিবে। পরীক্ষা শেষ হইলে সে উহাকে তাহার বাপের বাড়ীতে রাখিয়া আসিবে বা অন্য কোন ব্যবস্থা করিবে। অশোক দেখিল মেয়েটার হিতাহিত সম্বন্ধে অমিতাভও উদাসীন নহে, আপাততঃ সে দিদির কাছে থাকুক তাহারও এই মত।

স্নান করিয়া দিদির অনুরোধে আহার করিয়া অশোক হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিল। যে কয়দিন বনলতা দিদির আশ্রয়ে থাকিবে সে কয়দিন আর কোন ভাবনা নাই বলিয়া, অশোক নিশ্চিন্ত হইয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিল। দুই বৎসরই সে হৈ হৈ করিয়া কাটাইয়াছে,—পরীক্ষার এই কয়টা দিন আর ফাঁকি সে দিবে না ইহাই ঠিক করিল। পাঠের অবসরে ২৩ দিন অন্তর সে বনলতার খোজ লইয়া আসিতে লাগিল।

পরীক্ষা শেষ হইলে সে অমিতাভদের বাড়ী গিয়া বনলতার সহিত দেখা করিল। দিদির ঘরে বনলতার সহিত তাহার কথাবার্তা হইল—দিদি তখন ছিলেন পূজার ঘরে। অশোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কোথায় যাইতে চায়। সে যদি ইচ্ছা করে তবে সে

তাহাকে তাহার বাপের বাড়ীতে রাখিয়া আসিতে পারে। বাপের বাড়ী যাইতে না চাহিলে সে তাহাকে নিজেদের বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারে। তাহার মা তাহাকে নিজের কন্যার মতই গ্রহণ করিবেন। বনলতা দুইটা দিকই ভাবিয়া দেখিল। তাহার বাপের বাড়ী বলিতে তাহার মামার বাড়ী। মামার আশ্রয়ে তাহারা মানুষ হইয়াছে বটে, কিন্তু মামা ঠাচিয়া নাই। মামাতো ভাই আছেন, তাঁহার স্ত্রী বড় মুখরা। যাহা হউক বিধবা বোনকে তিনি ফেলিতে পারিবেন না। বহুদিন সে গ্রামে যায় নাই, জন্মভূমিতে যাইবার জন্ত তাহার একটা তীব্র ইচ্ছা হইল। কষ্ট-লাঞ্ছনা তাহাকে হয়ত সেখানে ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়, জীবন-প্রভাতেই সে যখন স্বামীকে হারাইল তখন সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি! আত্মীয়েরা তাড়াইয়া দিলে অনাত্মীয়দের আশ্রয় না হয় সে গ্রহণ করিবে, প্রথমে আত্মীয়দের দ্বারস্থ হইয়াই দেখা যাকনা কি হয়—এই সব ভাবিয়া বনলতা বলিল সে এখন তাহার দাদার বাড়ীতেই যাইতে চায়। অশোক এই লইয়া দিদির সঙ্গেও আলোচনা করিল—তিনিও বলিলেন সে এখন দাদার বাড়ী যাউক, তাহারা গ্রহণ না করিলে অন্য ব্যবস্থা করা যাইবে। অশোক বনলতাকে অমিতাভদের বাড়ীতে রাখিবার জন্ত অনুরোধ করিতে পারিত কিন্তু তাহা সে করিল না—কারণ অমিতাভদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে। তাছাড়া অমিতাভর স্ত্রী লেগা বনলতারই সমবয়সী, পতি-মতী তরুণীর সাহচর্য্য সন্তোষবিধবার মনের স্বাস্থ্যেরও ঠিক অশুকূল নহে, এইসব আলোচনা করিয়া বনলতার দাদাকে অশোক চিঠি লিখিয়া দিল—কোন দিন তাহারা সেখানে পৌঁছিবে। হরিসাধনের মৃত্যু-সংবাদ তাহাকে যথাসময়েই দেওয়া হইয়াছিল।

দুইদিন পরে বনলতাকে লইয়া অশোক দুপুরবেলা ঘুমকরা ষ্টেশনে

নামিল। এখান হইতে বনলতার মামার বাড়ী পাচ ক্রোশ। একটা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহারা চলিল। রাত্রি যখন নটা তখন তাহারা বনলতার মামার বাড়ী পৌছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া দেখা গেল—বাড়ীর দরজা ভেতর হইতে খিল দেওয়া, অশোক কড়া নাড়িতেই কে একজন বলিল—‘কে?’ অশোক সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি গলায় প্রশ্নের উত্তরও শুনিতে পাইল—‘কে আবার, তোমার সাপের বোন এল বোধ হয়! স্বামীর মাথা খেলেন এবার আসছেন আমাদের হাড় জ্বালাতে!’ তাহার পরক্ষণেই রামকিঙ্কর অর্থাৎ বনলতার মামাতো ভাই ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—“কে, লতি এলি নাকি?” বনলতা দাদাকে প্রণাম করিতে গিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রামকিঙ্কর তাহার পরুষ কণ্ঠে যথাসম্ভব কোমল করিয়া বলিল, ‘কি আর কর্বি বোন, তোর কপাল, নইলে বাবা ত তোর বিয়ে ভাল দেখেই দিয়েছিল, এখন এসেছিঁস্ থাক্ আমার কাছে।’ লোকটীর কথাবার্তা শুনিয়া অশোকের মনে হইল, বাড়ীর গৃহিণী যেমনই হউন না কেন এ লোকটা বিশেষ মন্দ নয়, শরীরে দয়া মায়া আছে! গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান জিনিষ-পত্রগুলি ততক্ষণে বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়াছিল। অশোক গাড়ীটাকে ধরিয়া রাখিল, ভোরেই একটা ট্রেন আছে কলিকাতার দিকে যায়। “আসুন, বাবুমশায়, হাত-পা ধোবেন আসুন”, বলিয়া রামকিঙ্কর তাহাকে বাড়ীর ভেতর ডাকিয়া লইয়া গেল। ঘরের দাওয়ায় একটা চৌকিতে তাহাকে বসিতে দেওয়া হইল। রামকিঙ্কর তাহাকে একা বসাইয়া কি যেন একটা কাজে উঠিয়া গেল। অশোক যেখানে বসিয়াছিল সেখান হইতে অদূরে রান্নাঘর,—অশোক শুনিতে পাইল বনলতার ভ্রাতৃজায়া তাহাকে অশোকের পরিচয় খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে। বনলতা তাহার স্বামীর সহিত অশোকের বন্ধুত্ব, স্বামীর অন্তরে তাহার উপকার প্রভৃতি যথাসম্ভব বর্ণনা করিয়া বলিল,—

“উনি দেবতা।” ভাতৃজ্ঞায়ার কৌতূহলের তবু নিবৃত্তি হইল না,—
 প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া সে বনলতাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে লাগিল।
 অশোকের মনে হইল, এই সন্দিগ্ধমনা পল্লী রমণী অশোকের কর্তব্য-
 পরায়ণতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকারকে বিকৃত করিয়া, তাহার সম্বন্ধে
 একটা মন্দ ধারণা পোষণ করিতেছে। বনলতা নিঃশব্দে সব শুনিয়া
 যাইতেছিল, একবার সে বলিল, “বৌ, উনি আমার বড় ভাইয়ের মত,
 ওঁকে আমি দাদা বলি, কোন দিন সময় এলে দেখ্বে ওঁর মত মানুষ
 আর হয় না।” অশোক অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদের কথোপকথন শুনিয়া
 যাইতেছে। এমন সময় রামকিঙ্কর একটা কাঁচা শালপাতা ও একটা
 প্রজ্জ্বলিত কলিকা লইয়া প্রবেশ করিল। রামকিঙ্কর কলিকা ও
 শালপাতাটা তাহাকে দিতে উদ্যত হইতেই অশোক বলিল—“ওত আমি
 খাইনা, রামকিঙ্কর বাবু।” রামকিঙ্কর একটু আশ্চর্য হইল, এত বড়
 ধেড়ে ছেলে তামাক খায় না কি! এ গ্রামে ও বয়সের যত ছেলে
 আছে সবাই ত তামাক খায়। অগত্যা রামকিঙ্কর একাই কলিকাটার
 সম্ভাবহার করিতে লাগিল। ইহার পর বনলতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে
 রামকিঙ্করের সঙ্গে অশোকের অনেক কথা হইল। অশোক এই ভাবিয়া
 আশ্বস্ত হইল যে, রামকিঙ্কর বুঝিয়াছে, বনলতা তাহারই আশ্রয়ে বাস
 করিতে আসিয়াছে। হঠাৎ এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে সে বলিল,
 “তবে জানেন কি বাবুশায়, বৌটা বড় দজ্জাল, লতি ছেলে মানুষ,
 ওর দাপট্ সহ্য করতে পারুলে হয়। দ্বিতীয় পক্ষের বৌ কিনা, হাড়টা
 আমার ভাজা ভাজা করে দিলে, কি আর করি বলুন, কর্মভোগ! বাবা
 লতিকে মেয়ের মত মানুষ করেছিলেন, ও আর এখন আমার কাছ ছাড়া
 আর কোথায় যাবে বলুন! আমিই কোন্ দিন ওকে নিয়ে আসতুম মশায়,
 এই ট্রেন ভাড়াটা কিছুতেই জোগাড় করে উঠতে পারলুম না; ধানের
 যা দর মশায় আমাদের অবস্থা, আর বলবেন না!” লোকটার সারল্যে

অশোক মুগ্ধ হইল। রাত্রে থাওয়া দাওয়ার পর যে ঘরে তাহার বিছানা হইয়াছিল সেখানে সে একবার বনলতাকে ডাকিল। ভোরেই সে চলিয়া যাইবে,—সে সময় আর দেখা করিবার সুবিধা তাহার হয়ত নাও হইতে পারে। বনলতা সে ঘরে আসিলে অশোক বলিল যে, সে সকালেই চলিয়া যাইবে। তাহার কলিকাতার ও বাড়ীর ঠিকানা দুই-ই দিয়া সে বলিল, বনলতা যেন তাহাকে নিয়মিত সংবাদ দেয় যে, সে কেমন থাকে, আর তাহার কোন অসুবিধা হইলে যেন তাহাকে জানায়। বনলতা ছল্ ছল্ নেত্রে বলিল, “আচ্ছা।...দাদা, এখন আপনি শুয়ে পড়ুন, ভোরেই আবার আপনাকে বেরতে হবে। আশীর্বাদ করুন পরজন্মে যেন আপনার বোন হয়ে জন্মাতে পারি।”

ভোরে উঠিয়া অশোক স্টেশনে আসিয়া কলিকাতাগামী ট্রেন ধরিল। বর্ধমানের নামিয়া সে আপু ট্রেনে বাড়ী যাইতে পারিত, কিন্তু সে বাড়ী যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। কলিকাতায় গিয়া প্রথমেই সে গেল দিদির কাছে। বনলতার দাদা যে তাহাকে স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে এ সংবাদ শুনিয়া তিনি খুব সুখী হইলেন। তবে লোকটা সরল ও ভাল মানুষ শুনিয়া তিনি একটু চিন্তিত হইলেন। কারণ এরূপ লোকের স্ত্রী কোপন স্বভাবা হইলে তাহাদের আর স্বাধীন মতামত বলিয়া কিছু থাকেনা। দিদি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন,—দুঃখিনী মেয়েটার সুখে থাকিবার আর উপায় নাই—সে যেন শান্তিতে থাকিতে পারে।

দিদির নিকট হইতে সে সোজা হোষ্টেলে গিয়া জিনিষ-পত্রগুলি গুছাইয়া লইল। তাহার পর একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে উঠিল। অমিতাভরা অসুস্থরোধ করিতেছিল তাহাদের নিকট দিন কতক কাটাইয়া যাইবার জন্ত। কিন্তু তাহাদিগের অসুস্থরোধ সে রাখিতে পারিল না—অনেকদিন সে বাড়ী যায় নাই। অমিতাভদের বলিল,

শীঘ্রই সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দিন কয়েক তাহাদের সহিত কাটাইয়া যাইবে।

পরীক্ষার দুশ্চিন্তা এবং বনলতার ভাবনা তাহাকে কিছুকাল যাবৎ বড়ই পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। সম্প্রতি এই দুইটা ভার হইতেই মুক্তি লাভ করায় তাহার শরীর ও মনের স্বাভাবিক ক্ষুধা আবার ফিরিয়া আসিল। হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া তাহার মনে হইল, কোনবারই বাড়ী যাইবার সময় তাহার এত আনন্দ হয় নাই।

(১৭)

রাত্রি দশটার সময় অশোক বাড়ী পৌছিল। পরীক্ষা কেমন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় অশোক বাবাকে বলিল, লজিক্ পেপারটা তাহার ভাল হয় নাই, আর সব বেশ ভাল হইয়াছে। খাইতে বসিয়া অশোক তাহার মাকে বনলতার বিবরণ সমস্ত আত্মপূর্বিক খুলিয়া বলিল। অশোকের মা হরিসাধনকে ছেলের মত ভালবাসিতেন। তাহার মৃত্যু-সংবাদ তিনি অশোকের পত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন। অশোক যে পরীক্ষা দিয়াই বনলতাকে তাহার মামার বাড়ীতে রাখিতে গিয়াছিল, ইহাতে তাহার কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় পাইয়া তিনি স্থখীই হইলেন।

পরের দিন সকালে উঠিয়া অশোক প্রশান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। প্রশান্তবাবুকে প্রণাম করিতে গিয়া অশোক দেখিল, প্রশান্তবাবুর শরীর হইতে যেন দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তাহার জ্যোতিষ্মান চক্ষু দুইটির দিকে তাকাইয়া মনে হইতে লাগিল, সাধনার পথে তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। দীর্ঘকাল পরে অশোককে দেখিয়া তিনি বড় আনন্দিত হইলেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত

কুশল প্রশ্নাদি করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অশোকের বাড়ী আসিতে এত দেরী হইল কেন। অশোক হরিসাধনের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার স্ত্রীকে মামার বাড়ী রাখিয়া আসা পর্য্যন্ত সমস্তই বলিল। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া প্রশান্তবাবু বড় বিচলিত হইয়া বলিলেন, “বাবা, ওই অভাগিণী মেয়েটী দীর্ঘজীবন ধরে যে বিভ্রম্না ভোগ করবে তার আর তুলনা নাই ! অকাল বৈধব্য যে কত মেয়ের জীবনকে বিষময় করে তুলছে তার সংখ্যা করা যায় না !”

এবারকার ছুটিতে অশোক কাকাবাবুর মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিল। কলেজে পড়িয়া এই কয়বৎসরে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি অনেকটা বাড়িয়াছে। আগে কাকাবাবুর চিন্তা-প্রণালী অনুধাবন করিতে তাহার যে অসুবিধা হইত ক্রমে সে অসুবিধা দূর হইয়া আসিতে লাগিল। পূর্বে সে ছিল শুধু শ্রোতা, এখন কোন প্রসঙ্গ উঠিলে সে আবগুকমত নিজের মতামতও দিত এবং তর্ক তুলিত। অশোককে হৃদয় ও বুদ্ধি উভয়দিক হইতেই আদর্শ মানুষ্য করিয়া তুলিবেন, অশোকের সংস্পর্শে আসার পর হইতে, ইহাই ছিল প্রশান্ত বাবুর অগ্রতম সঙ্কল্প। সকল দিক্ হইতেই অশোক যে আদর্শ মানুষ্য হইয়া উঠিতেছে ইহা দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই। অশোকের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি অনেক প্রসঙ্গ তুলিতেন। জনসাধারণের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, সামাজিক ব্যাধি প্রভৃতি লইয়া অশোকের সঙ্গে তাঁহার এবার অনেক আলোচনা হইল। প্রশান্ত বাবু অশোককে প্রায়ই বলিতেন, একদিন তাঁহার ইচ্ছা ছিল, দুঃস্থ জনসাধারণের হিতার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করিবেন। এইভাবেই তিনি নিজের জীবন গঠনও করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্তরূপ, তিনি তাঁহাকে ভিন্ন পথে ডাকিয়া লইলেন। প্রশান্তবাবু আভাসে অনেক সময় বলেন, অশোককে তিনি এইপথে দেখিতে চান।

নিজের নিজের উদরপূর্তি, আত্মীয়-স্বজনের গ্রাসাচ্ছাদন অতি সামান্য মানুষও করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা সাধারণের অপেক্ষা একটু উচ্চে, খাওয়া-পরাই স্থূল প্রয়োজনের মধ্যে তাহারা তাহাদের সমস্ত শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। এইরূপ অনন্ত-সাধারণ মানুষ দুইচারিজন জন্মিয়াছেন বলিয়াই, পৃথিবীতে হইয়াছে সঙ্গীত কাব্য ও চিত্রকলার সৃষ্টি। সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতা ইহাদেরই আন্দোলনের ফলে জন্মও পুষ্ট-লাভ করিয়াছে। জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইহারা জগতের বরেণ্য। পৃথিবীতে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন। নিজের দুঃখে সকলেই কাঁদিয়া থাকেন—কিন্তু ইহারা পরের দুঃখে ব্যথিত হইয়া কাঁদিয়াছেন,—যেমন খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য। ইহারা মহামানব ইহাদের সাধনাই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ-সাধনা। লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের ভার ইহারা হরণ করিয়াছেন। প্রশান্তবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে আদর্শবাদী অশোকের মনে এক নূতন প্রেরণা জাগে, তাহার মানস-নেত্রে জাগিয়া উঠে ক্রিমিয়ার রণক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরায়ণা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, জনহাওয়ার্ড ও বিদ্যাসাগরের কাহিনী। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে, জীবিকা-অর্জনের জগৎ তাহাকে যখন ভাবিতে হইবেনা তখন সে এমনি করিয়াই নিজের জীবন যাপন করিবে। সুযোগ যখন পাইয়াছে তখন তাহার অপব্যবহার সে করিবেনা।

পরীক্ষা দেওয়ার পর দুই তিনমাস সে বনতুলসীতেই কাটাইল। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, অশোক বাদলা ও ইতিহাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও তাহার পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় নাই,—বড়জোর একটা সেকেণ্ড-গ্রেড স্কলার-শিপ পাইয়া যাইবে। অশোকের ইচ্ছা এইবার সে ইতিহাসে অনার্স পড়িবে। ইতিহাসে যখন তাহার ঝোঁক, তখন প্রশান্তবাবু ও কিরণবাবু তাহাকে

বাধা দিলেন না। অশোক আবার কলিকাতায় আসিয়া তাহাদের পুরাতন কলেজেই ভর্তি হইল, কারণ কলেজের অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যে তাহার গভীর আস্থা ছিল। কিরণবাবু অশোকের ফল ভাল না হওয়ায় একটু দুঃখিত হইলেন। অশোককে ভাল করিয়া পড়াশুনা করিবার উপদেশ দিলেন, তবে দেশের সেবা অল্প করিও এ কথাটা কিরণবাবু অশোককে প্রাণের সহিত বলিতে পারিলেন না। জীবনে প্রবেশ করিবার পর মানুষ সক্ষীর্ণ ও স্বার্থপর হইয়া আসে, ইহা তিনি জানেন। ছেলেবেলা হইতেই ছেলেকে স্বার্থপর করিয়া তোলা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাছাড়া অশোকের যে যথেষ্ট হিতাহিত জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার সে ধারণা জন্মিয়াছিল। সুতরাং ছেলের কাছে তিনি নিজেকে ছোট করিতে চাহিলেন না। তাঁহার ছেলে যে উচ্চ-হৃদয়ের অধিকারী ইহাতে তিনি গর্কসই অনুভব করিতেন।

থার্ড-ইয়ারে পড়াশুনার তেমন চাপ নাই। অশোক দেখিল, এই সময় অনেক কাজ সে করিতে পারে। দুই বৎসরে কলিকাতার ছাত্র-মহলে তাহার কিছু প্রতিপত্তি হইয়াছিল। অশোক দেখিল নানা বিক্ষিপ্ত আন্দোলনে ছাত্রদের যে শক্তি ব্যয়িত হয়, সেটাকে দেশের কাজে নিয়োজিত করিলে, দেশের অনেক উপকার হইতে পারে। “ছাত্রসেবা-সঙ্ঘ” নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ছাত্রদিগকে জনহিতকর কাজে নিয়োজিত করার তাহার ইচ্ছা। দীর্ঘ অবকাশগুলিতে গ্রামে গ্রামে ঘাইয়া ইহার সভারা গ্রামবাসীদিগকে লেখা-পড়া শিখাইবে, কুটীর-শিল্প প্রচলনে উৎসাহ দিবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিখাইবে, মত্তবর্জন করাইবে, ঝোঁপ-জঙ্গল সাফ করিয়া ম্যালেরিয়া তাড়াইবে। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া পানীয় জলের ব্যবস্থা করিবে এবং কোন স্থানে মহামারী, ভূমিকম্প অথবা বন্যা হইলে দুর্গতদের সেবার ব্যবস্থা করিবে ইত্যাদি। অশোক তাহার পরিকল্পনার কথা কয়েকজন আশ্রয়

দেশসেবক ও অধ্যাপকদের জানাইল। অশোক শুধু কল্পনাপ্রবণ, ভাব-বিলাসী ভালো ছেলেই নহে এসব বিষয়ে যে তাহার অভিজ্ঞতা ও পরিচালন ক্ষমতাও আছে, ইহা তাঁহারা জানিতেন। কাজেই, তাঁহারা তাহার প্রস্তাবটা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। বড়দের কাছে উৎসাহ পাইয়া অশোক এক বিস্তৃত পরিকল্পনা খাড়া করিল। ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী, কমার্শিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা স্থান হইতে সে এ বিষয়ে খবরাখবর লইল। কলিকাতার প্রতিষ্ঠাপন্ন ছাত্রদের কাছেও যথেষ্ট সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইল। প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলি শেষ করিয়া অশোক ছাত্রসেবা-সঙ্ঘের জন্ম সদস্য সংগ্রহ করিল আশানুরূপ। কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে একদিন সভা করিয়া পরিচালক সমিতির সভ্য নির্বাচন হইল। কোন দেশমাত্র বৃদ্ধ অধ্যাপক পরিচালক সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা অশোক সর্বসম্মতি-ক্রমে সঙ্ঘের সম্পাদক নির্বাচিত হইল। কয়েক মাসের মধ্যে ‘ছাত্র-সেবা-সঙ্ঘ’ বাঙ্গলা দেশের একটা সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিল। বাঙ্গলাদেশের বড় বড় কাগজগুলিতে প্রত্যহ সঙ্ঘের কার্যাবলীর বিবরণ বাহির হইতে লাগিল। অনেক কাগজে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ছাত্রনেতা অশোক চৌধুরীর সচিত্র জীবনীও প্রকাশিত হইয়া গেল।

(১৮)

সঙ্ঘের কার্য মাস ছয়েক বেশ ভাল ভাবেই চলিল। হঠাৎ একদিন অশোক তাহার বাবার নিকট হইতে সংবাদ পাইল প্রশান্তবাবু মারা গিয়াছেন। নিত্যকার মত বৈকালে কুঠীতে বেড়াইতে গিয়া তিনি দেখেন যে, পূজার ঘরে প্রশান্তবাবুর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, সম্ভবতঃ ঘণ্টাকয়েক পূর্বে হার্টফেল করিয়া তাঁহার

মৃত্যু হইয়াছে। সংবাদটী অশোককে অত্যন্ত বিচলিত করিল। সে বহুক্ষণ ধরিয়া শিশুর ত্রায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। প্রশান্তবাবুর সহিত পরিচিত হওয়ার পর হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধীয় নানা ঘটনা তাহার মনের চিত্রপটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। প্রশান্তবাবুর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, সারল্য, উদার্য্য, ধর্ম্ম-পরায়ণতা, সর্বোপরি অশোকের প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ এবং তাহার শুভাশুভ সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ এই সকল কথা তাহার শোকাচ্ছন্ন মনকে পীড়িত করিতে লাগিল। সারাদিন বিছানায় পড়িয়া অশোক শুধু প্রশান্তবাবুর কথাই ভাবিতে লাগিল। এবার যখন সে বনতুলসীতে যাইবে তখন সর্ব্বাগ্রে প্রশান্তবাবুকে প্রণাম করিয়া আসিবার আর প্রয়োজন হইবে না। তাহাকে দেখিয়া তাঁহার প্রশান্ত মুখখানি আর নির্মল হাসিতে ভরিয়া উঠিতে দেখিবে না,—এই চিন্তা দুঃসহ হইয়া তাহার বুকে বাজিতে লাগিল। অশোক মনে ভাবিল, সকলেই তাহাকে ভাল ছেলে বলে, আদর্শ যুবক বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ সব কাকাবাবুর শিক্ষার গুণে। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় সে জীবনকে এমন করিয়া গঠন করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। অশোক ভাবে কাকাবাবুর সংস্পর্শে না আসিলে সে এতদূর উন্নত জীবন যাপন করিতে পারিত না। আর একটা কথা তাহার মনে জাগিল, কাকাবাবুর মত মানুষ সংসারে অল্পই জন্মগ্রহণ করে। এমন যে মানুষ তাহার মহত্ব অধিক লোকে জানিতে পারিল না। লোকলোচনের অন্তরালেই তাঁহার জীবন-দীপ নিভিয়া গেল—এইটাই তাহার বুকে শেলের মত বাজিতে লাগিল। প্রশান্তবাবুর স্বাস্থ্য মন্দ ছিল না। তাঁহার মৃত্যু যে এমন আকস্মিক ভাবে হইবে ইহা অশোক পূর্বে ধারণার মধ্যে আনিতে পারে নাই। প্রশান্তবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার কয়েকদিন পরেই সে বাড়ী গেল। বাড়ী গিয়া সে শুনিল, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে প্রশান্তবাবু কিরণবাবুর হাতে একটা মোটা

সীলকরা খাম দিয়া, বলিয়াছিলেন, ‘মানুষের জীবন, কখন কি হয় বলা যায় না, আমি যদি মারা যাই তবে এটা অশোকের হাতে দেবেন।’ মানুষ মৃত্যুর পূর্বে কিছু বুঝিতে পারে কিনা কে জানে, হয়ত বা কেহ কিছু আভাস পায়। সলিল সমাদির অনতিকালপূর্বে শেলীর আকাজক্ষা তাহার মনে পড়িয়া গেল—

I could lie down like a tired child
And weep away the life of care,
Which I have borne, and yet must bear,
Till death like sleep might steal on me,
And I might feel in the warm air
My cheek grow cold, and hear the sea
Breathe o'er my dying brain its last monotony.

হয়ত প্রশান্তবাবু তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সীল্ ভান্সিয়া খাম খুলিয়া অশোক প্রশান্তবাবুর একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি ও একতাড়া নোট পাইল। চিঠির মর্ম এই যে, তিনি চাকরী করিবার সময় হাজার ছয়েক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল—শিশু-পুত্রদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবেন। কলেবায় একরাত্রে মধ্যো তাঁহার দুই পুত্র ও স্ত্রী মারা যান, তিনি তখন ছিলেন কলিকাতায়। দুঃসহ আঘাত পাইয়া জীবনে তাঁহার বিতৃষ্ণা আসে। শাস্তির সন্ধানে সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি তীর্থে তীর্থে বহুদিন পরিভ্রমণ করেন। শেষে কেদারবদরীর পথে এক সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হয়। প্রশান্ত বাবু ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ইহারই নির্বন্ধাতিশয্যে দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে ফেরার পরের ইতিহাস অশোকদের অজানা নয়। পত্রের শেষে প্রশান্তবাবু লিখিয়াছেন,—তিনি অশোককে ছেলের মত ভালবাসেন, তাঁহার মৃত্যুর পর টাকাটা সে যেন গ্রহণ

করে এবং ইচ্ছামত বায় করে। এই ব্যাপারে প্রশান্তবাবু তাহাকে কি গভীর ভাবে স্নেহ করিতেন তাহার আরও একটি পরিচয় পাইয়া অশোকের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কলিকাতায় ফিরিয়া অশোক পাঁচহাজার টাকা চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল ও বেলগাছিয়ার কারমাইকেল হাসপাতালে প্রশান্তবাবুর স্মৃতিরক্ষার্থে দান করিল। বাকী একহাজার টাকা সে ছাত্র-সেবা-সঙ্ঘের তহবিলে মজুত রাখিল—পল্লী-উন্নয়ন কার্যে বায় করিবার জন্ত। পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে প্রশান্তবাবুর গভীর আগ্রহের কথা অশোকের অজানা ছিল না। তাঁহারই প্ররোচনায় ছাত্র-সেবা-সঙ্ঘের কার্যতালিকায় পল্লী-উন্নয়ন স্থান পাইয়াছিল। ছাত্র-সেবা-সঙ্ঘ ধীরে ধীরে দেশের বিশিষ্ট ধনীদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। এই সব ধনীর নিকট হইতে দানে ছাত্র সেবা-সঙ্ঘের ধনভাণ্ডার ইতিমধ্যেই বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। অর্থের সচ্ছলতা থাকায় সঙ্ঘের কাজও বেশ দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই সময় আর একটা ব্যাপার হইল। অমিতাভ মধ্য প্রদেশে বন বিভাগে একটা চাকরী পাইয়া কলিকাতা হইতে বাসা তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আই-এ-তে স্কলারশিপ না পাওয়ায় তাহাদের বড় আর্থিক কষ্ট যাইতেছিল। অমিতাভের মামা ভারত সরকারে বেশ বড় চাকরী করেন, তাঁহারই চেষ্টায় অমিতাভ চাকরীটা পাইল। ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া কলিকাতায় অশোক পারিবারিক জীবনের আনন্দ আন্বাদন করিত। প্রশান্তবাবুর মৃত্যুর পর অমিতাভের সঙ্গ হইতেও বঞ্চিত হইয়া অশোকের মন বড় দমিয়া গেল।

(১৯)

মামাতো দাদার আশ্রয়ে আসিয়া কিছু দিনের মধ্যেই বনলতা বুঝিল, দীর্ঘকাল তাহার এখানে জীবন যাপন অসম্ভব। ভ্রাতৃজায়া রাজবালা যেমন মুখরা তেমনি নীচমনা। বনলতা আসার পর হইতেই, কোথা-হইতে-ঘাড়ে-আসিয়া-পড়া-স্বামী-হীনা মেয়েটির উপর তাহার রসনার সমস্ত বিষ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বনলতার দাদা রামকিঙ্কর নেশাখোর মাছুষ, দিবারাত্র আফিমের ঘোরে পড়িয়া থাকেন। সময় সময় তাঁহার মনে হয়, রাজবালা বনলতাকে বড় জ্বালাইতেছে, মুখে কিন্তু কিছু বলিতে পারেন না—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলেন। প্রথম কয়মাস রাজবালা শুধু বাক্য-বাণ ব্যবহার করিত। কয়েক মাস যাওয়ার পর হইতে চেলা-কাঠ, ঝাঁটা প্রভৃতির দ্বারা সে বনলতাকে আপ্যায়িত করা আরম্ভ করিল। রাজবালা নাম-করা মুখরা। প্রতিবেশীরা আসিয়া যে বনলতাকে রক্ষা করিবে সে উপায়ও ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কোন প্রতিবেশীই তাহার উদ্ধতন সপ্তম পুরুষকে গালি খাওয়াইতে রামকিঙ্করের বাড়ীতে পদার্পণ করিত না। বনলতা আসার পর হইতে সংসারের সমস্ত ভারই তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। একাদেশীর দিন-অভুক্ত উপবাসক্লিষ্ট দেহেও তাহাকে বাড়ীর কাজকর্ম সব করিতে হইত। রাজবালার কড়া শাসনে সে গ্রামের কোন মেয়ের সঙ্গে মিশিতে পাইত না। দিনান্তে-বৈকালে সে একবার পুকুরে গা ধুইতে যাইতে পাইত—সংসারের বাবহাণ্ড্য জল তাহাকে দিয়া না আনাহিলে চলিতনা বলিয়াই। কলিকাতায় অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে সে বাস করিত, তার উপর বয়স ছিল অল্প, শৈশবাবস্থা বলিলেই চলে। দাদার বাড়ীতে আসার পর শত অনাদরেও পাড়াগাঁয়ের জল হাওয়ায় তাহার স্বাস্থ্য-শ্রী-মণ্ডিত হইয়া উঠিতে

লাগিল। অদৃষ্টের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে, বয়োধর্মের জন্ত দাদার বাড়ীতে আসার পর হইতে তাহার দেহে রূপ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। বিধবা বিশেষতঃ বালবিধবার রূপ যে কত বড় শত্রু এটা বুঝিবার বয়স তাহার হইয়াছিল। বৈকালে পুকুরে যখন সে জল আনিতে মাইত, তখন সে বেশ বুঝিতে পারিত যে, গ্রামের ছেলেরা এমন কি বাপের বয়সী পুরুষেরাও লোলুপদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। তবে কেহ তাহাকে কিছু বলিতে বা তাহাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেষিতে সাহস করিত না। কারণ রাজবালার তীক্ষ্ণ রসনা এবং চঞ্চল সম্মার্জনীকে সকলেই ভয় করিত।

এখানে আসিয়া সে কয়েকবারই অশোকের পত্র পাইয়াছিল। সেও এইসব পত্রগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তরে লিখিয়াছিল, সে ভাল আছে তাহার জন্ত ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহার কষ্টের কথা লিখিয়া জানান বনলতা উচিত বলিয়া মনে করে নাই। আত্মীয়ের আশ্রয়ে যে সে বাস করিতে পাইয়াছে এই-ই খুব! তাছাড়া অশোক তাহার স্বামীর বন্ধু ছাড়া আর কিছু নহে, দাদার আশ্রয়ে কষ্ট হইলেও এখানেই তাহাকে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

বনলতা আসার বৎসরখানেকের মধ্যে শীতকালে হঠাৎ তিনদিনের জরে ভুগিয়া বনলতার দাদা রামকিঙ্কর মারা গেলেন। বনলতার উপর রাজবালা কোন দিনই প্রসন্ন ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর সে বনলতাকে যথেষ্ট গালাগাল ও প্রহার আরম্ভ করিল। তাহার মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই অলক্ষণে মেয়েটাই তাহার স্বামীকে খাইয়া ফেলিল। রামকিঙ্কর বর্তমানে রাজবালা বনলতার উপর যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করিলেও তাহার একটা সীমা ছিল। কিন্তু রামকিঙ্কর মারা যাওয়ার পর বনলতার অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। ইহার পর এক

নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিল—রাজবালার এক বিপত্নীক ভ্রাতা পাচকড়ি। লোকটা ছিল কোন এক যাত্রার দলের নাচের মাষ্টার। ভগ্নীপতি মারা যাওয়ার পর বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনার অজুহাতে সে আসিয়া জুটিল বনলতার দাদার বাড়ীতে। আসিয়া অবধি বনলতার উপর সে অত্যধিক মনোযোগ প্রদর্শন আরম্ভ করিল। বনলতা হয়ত ভাতের হাঁড়ী নামাইতে যাইতেছে এমন সময় পাচকড়ি “আহা-হা দাড়াও দাড়াও আমি নাগিয়ে নিচ্ছি”, বলিয়া সেটা নামাইয়া দেয়। কোন শ্রমসাধ্য কাজ করিতে দেখিলেই ছুটিয়া যাইয়া তাহা করিয়া দেয়। বনলতা দুপুর বেলায় হয়ত অসংযত বস্ত্রে সেলাই করিতেছে—পাঁচকড়ি সেখানে নিঃশব্দে গিয়া হাজির হয়, অমনি একগাল হাসিয়া বলে—“কিগো লতা ঠাকরণ কি হচ্ছে।” একদিন ত সে লতার হাতই ধরিয়া ফেলিল। বনলতা লজ্জায় প্রথম প্রথম কিছু বলিতে পারিত না। একদিন বাধ্য হইয়া সে রাজবালাকে বলিল, তাহার ভাইএর আচরণের কথা। ইহার উত্তরে রাজবালা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, “যা-যা নেকি ছুঁড়ী আর সতী সাজিস না, পাতানো ভাইএর সঙ্গে ত আর কিছু বাকী রাখিস্ নি, মাসে মাসে পত্র লেখ। আরও কত কি! আঃ কি আমার স্বামীর বন্ধুরে, এখানে আমার ভাই থাকবে, তোর না পোষায় চলে যা এখান থেকে।” অপমানে লজ্জায় ঘুণায় বনলতা কাঁদিয়া ফেলিল। সে ভাবিয়া দেখিল, এখানে থাকিলে তাহার বিপদ স্থনিশ্চিত। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি সে তাহাই ভাবিতে লাগিল। সে ভাবিল, কলিকাতায় গিয়া সে দিদির বাড়ীতে আশ্রয় লইবে, তাহার পর তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতায় সে কোন একটা চাকরী জোগাড় করিয়া লইবে। অশোককে বিব্রত করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সে ঠিক করিল,—কলিকাতায় গিয়া দিদির নিকটেই প্রথমে উঠিবে।

রাজবালার নিকট অভিযোগ করার দিন হইতে বনলতার উপর

নিখ্যাতন আরও বাড়িয়া উঠিল। বনলতা ভাবিল, সে থাকিলে তাহার বৌদিদির স্ববিধা ভিন্ন অস্ববিধা নাই, কারণ সে বসিয়া খায় না। বাড়ীর সমস্ত কাজই করে। রাজবালা সে আর কোথাও যে যায় ইহা অবশ্য চায় না। তাহার স্বভাব দোষেই সে তাহাকে নিখ্যাতন করে। বাড়ী হইতে সে অল্পত্র গিয়া আশ্রয় লইয়া শাস্তি লাভ করিবে বলিলে, রাজবালা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না, বিশেষতঃ পাঁচকড়ি। কাজেই বনলতা ঠিক করিল তাহাদিগকে না বলিয়াই সে গৃহত্যাগ করিবে। গৃহত্যাগ করিলে অবশ্য তাহার নামে কলঙ্ক রটিবে, কিন্তু অন্তরে পবিত্র রহিয়া কলঙ্ক-রটা, পাঁচকড়ির অঙ্কশায়িনী হওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল, ইহা সে বিবেচনা করিয়া দেখিল। বৎসরাধিক-কাল যাহাদের নিকট বাস করিয়া বিন্দুমাত্র শাস্তি সে পায় নাই তাহাদের নিন্দা স্ততির কি যে মূল্য আছে ইহা সে বুঝিতে পারিল না। গৃহত্যাগ করিয়া আসায় যদি সে কোন লোকের বাড়ী চাকরী না পায়, তবে সে, যে সব জায়গায় অনাথা বিধবাদের আশ্রয় দেওয়া হয় এই সব জায়গায় আশ্রয় লইবে। কলিকাতায় থাকিতে সে শুনিয়াছিল, কলিকাতায় এমন অনেক আশ্রয় আছে। তাহাদের গ্রামেরই একটি ছেলে কলিকাতায় একটা দোকানে চাকরী করে। ছেলেটির নাম অমূল্য। অমূল্যর একটি বোন ছিল বনলতার সই, এইজন্ত বনলতা অমূল্যকে দাদা বলিত। মেয়েটি ৬৭ বছর বয়সে মারা যায়। বনলতা যে সময় এইসব কথা ভাবিতেছে সে সময় অমূল্য কয়দিনের ছুটি পাইয়া বাড়ী আসিল। বনলতা একা কলিকাতা যাইতে পারে না। এইজন্ত সে একদিন অমূল্যর সঙ্গে দেখা করিয়া সব কথা বলিল। বনলতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়ার প্রস্তাবে অমূল্যর বিশেষ আপত্তি ছিল,—সে বলিল, বনলতাকে সঙ্গে লইয়া গেলে তাহারই নামে কলঙ্ক রটিবে। বুদ্ধ মা কোন্‌দিন মরিয়া যায় ঠিক নাই, বনলতার জন্ত

সে কলঙ্ক লইতে প্রস্তুত নয়। সে যতই ভাল ছেলে হউক না, এবং বনলতা যতই ভাল মেয়ে হউক না কেন, লোকের মুখ তাহাতে বন্ধ হইবে না। বনলতার কান্নায় ও নিজে কি যেন চিন্তা করিয়া সে অবশেষে রাজী হইল। ঠিক হইল যে, সে ছুটি ফুরাইবার দুইদিন আগে বাড়ী হইতে বাহির হইবে, এবং বর্দ্ধমানে গিয়া এক বন্ধুর বাড়ী অপেক্ষা করিবে। বনলতা যদি অমূল্য যাওয়ার দুইদিন পরে দুপুরের ট্রেণে উঠে তবে অমূল্য সহিত তাহার বর্দ্ধমানে দেখা হইবে। তারপর অমূল্য তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া কলিকাতায় তাহাকে দিদির বাসায় পৌছাইয়া দিবে। বনলতা দেখিল গ্রামের কোন ছেলেই তাহাকে কলিকাতা পৌছাইয়া দিতে রাজী হইবেনা, সত্য হউক মিথ্যা হউক, কলঙ্কের একটা ভয় আছে, সকলের অবস্থা ত আর তাহার মত দুঃসহ নহে। অমূল্য যখন বর্দ্ধমান হইতে তাহার সঙ্গে থাকিবে তখন আর ভয় কি! শেষরাত্রে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দুপুরের ট্রেণে সে ঠিক ধরিতে পারিবে। অমূল্যর সঙ্গে বনলতার কথা হইল এই যে, বনলতা যদি কোনদিন গ্রামে ফেরে তাহা হইলে সে যেন কোনদিন প্রকাশ না করে যে, অমূল্যর সঙ্গে সে কলিকাতায় গিয়াছিল। সে বলিল বনলতার অত্যন্ত কষ্ট দেখিয়া এবং বোনের সই বলিয়াই সে এত বড় বিপজ্জনক কাজটা করিতে রাজী হইতেছে। বনলতা অমূল্যকে প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিল। রাজবালার মাধ্যাক্ষিক নিদ্রার সুযোগে সে অমূল্যর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া দিদিকে সে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইল, কি অবস্থায় বাড়ী ছাড়িয়া সে তাহার আশ্রয়ে যাইতেছে। সে যে কলিকাতায় যাইতেছে অশোককে ইহা জানাইবার জন্য সে দিদিকে লিখিল। দুইদিন পরে অমূল্য নির্দ্ধারিত মত বাড়ী হইতে বাহির হইল। যাইবার সময় সে সকলকে বলিয়া গেল ছুটি কম, আর বেশী বাড়ীতে থাকিলে কাজের ক্ষতি হইবে।

(২০)

অমূল্য বাড়ী হইতে যাওয়ার দুইদিন পরে শেষ রাত্রে বনলতা বাড়ী হইতে বাহির হইল। তখনও রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে ছড়ানো ছিল। অন্ধকার থাকিতেই তাহাকে এ অঞ্চল ছাড়িয়া যাইতে হইবে, নতুবা ধরা পড়িবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। একা পথ চলিতে তাহার বড় ভয় করিতে লাগিল। ইতিপূর্বে সে আর কখনও একা বাড়ীর বাহির হয় নাই। দিনের আলো ভাল করিয়া ফুটিবার আগেই সে গ্রাম হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। এবার সে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিল। যাক্ এবার আর ধরা পড়িবার আশঙ্কা রহিল না। ছপ্পর বেলা সে যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল, ট্রেন আসিতে তখনও অনেক দেরী। ষ্টেশনের নিকটে একটা দোকানে সে কিছু মুড়ী ও বাতাসা কিনিয়া খাইল। কলিকাতাগামী গাড়ী আসিতেই সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ীতে উঠিবার আগে মনে মনে বলিল,—‘হে ঠাকুর, ইহার ফল যেন মন্দ না হয়।’ ট্রেনে উঠিয়া বনলতার মনে হইল, অমূল্যর কথার উপর বিশ্বাস করিয়া হয়ত সে ভাল করিল না। অমূল্য যদি বদ্ধমানে তাহার জ্ঞান অপেক্ষা না করে তবে ত সর্বনাশ হইবে, একা সে কলিকাতা যাইবে কেমন করিয়া! আর একটা কথা তাহার মনে হইল, অমূল্যর সঙ্গে কলিকাতা যাওয়া কি ভাল হইতেছে? অমূল্য যদি তাহাকে দিদির বাসায় না লইয়া যায়! তাহার যে কোন গুঢ় অভিসন্ধি নাই, ইহা কে বলিতে পারে? কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বনলতার মনে হইল, অমূল্যকে সন্দেহ করা তাহার অন্তর্চিত, একই গ্রামের ছেলে মেয়ে তাহারা। বিশেষতঃ অমূল্যকে সে দাদা বলে, অমূল্য কি তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে! অমূল্য যে

সহানুভূতিশীল এবং উচ্চমনা যুবক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি তাহা না হইত তবে সে কিছুতেই বনলতাকে কলিকাতা পৌছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিত না। তাহারই বিশেষ অন্তরোধে অমূল্য একাজ করিতে সম্মত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান ষ্টেশনের প্র্যাট্‌ফর্মে গাড়ী প্রবেশ করিতেই, বনলতা কম্পিত হৃদয়ে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল অমূল্য আসিয়াছে কিনা? অমূল্য পূর্ব হইতেই প্র্যাট্‌ফর্মে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বনলতার মন কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া উঠিল। ট্রেন থামিতেই অমূল্য বনলতাদের গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে বনলতাদের কক্ষের আর সব যাত্রী বর্দ্ধমানেই নামিয়া গেল।

অমূল্য আসিয়া ঠিক বনলতার পাশে বসিতেই বনলতা ঈষৎ সরিয়া গেল। অমূল্য আর একবার বনলতাকে শপথ করাইয়া লইল— যে, যদি সে কোনদিন গ্রামে ফিরিয়া যায়, তবে যেন কাহাকেও না বলে অমূল্যের সঙ্গে সে কলিকাতা গিয়াছিল। ইহার উত্তরে বনলতা বলিল, “দাদা, আপনি মিথ্যে ভয় করছেন, গাঁয়ে ফেরার পথ ত চিরদিনের মত বন্ধ করে এলাম সেখানে আর দাঁড়াব কোন মুখে!” বর্দ্ধমান হইতে গাড়ী ছাড়িতে আর কয়মিনিট দেরী আছে, এমন সময় সেই কক্ষে একটা বালক ও একটা মধ্যবয়সী মহিলা প্রবেশ করিলেন। গাড়ী ছাড়িলে তিনি বনলতার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন। একজন সুন্দরী কিশোরী বিধবাকে অত্র একজন পুরুষের সঙ্গে যাইতে দেখিয়া তাঁহার মনে কেমন যেন সন্দেহ জন্মিল। বনলতা তাঁহার কৌতূহল নিবারণের জন্ত বলিল, “উনি আমার ভাই, ভায়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি।” শ্বশুরবাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করায়, বনলতা দিদির বাড়ীর বাস্তার নাম ও নম্বর বলিল। মিথ্যা কথা বলায় সে কোন দিনই অভ্যস্ত নহে, আজ দায়ে পড়িয়া

মিথ্যা কথা বলিতে গিয়া তাহার গলা শুকাইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে অশান্তি ও সন্দেহের বাড় বহিতেছিল। মহিলাটি আসায় তাহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া তাহার হৃদয়ের ভার একটু কমিয়া গেল।

ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছিল নটার কিছু পরে। হাওড়া স্টেশনে অমূল্য একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিল। গাড়ীতে উঠিয়া সে গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, বনলতার ঠিক পাশে ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিল। তাহার এই ঘনিষ্ঠতায় বনলতার বিরক্তির সীমা রহিল না, ট্রেনেও এইভাবে সে বসিতে আসিয়াছিল। একবার তাহার মনে হইল, তবে কি অমূল্য তাহাকে ভ্রষ্টা নারী বলিয়া মনে করিতেছে? সে ত তাহা নহে, অমূল্যকে সে দাদা বলিয়া ডাকে, একই গ্রামের ছেলে-মেয়ে তাহারা, তাহার ঐকি ব্যবহার! যে অমূল্যকে অবলম্বন করিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে, সেই যদি আজ তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করে, তবে সে আর কাহাকে বিশ্বাস করিবে! একবার তাহার মনে হইল, না না সে ভুল করিতেছে। অমূল্যের উপর সে অবিচার করিতেছে। গাড়ী অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিতেছিল, বনলতা একবার জিজ্ঞাসা করিল, “দাদা, এখান থেকে দিদির বাসা আর কতদূর?” অমূল্য হঠাৎ তাহার হাতখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, “যাবে গো যাবে, দিদির বাড়ী যাবে, কেন আমার কাছে কি পারাপ লাগছে?” বনলতা বিস্মিত হইয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা বাড়ীর সামনে গাড়ী থামিল। গাড়োয়ানকে বেশী ভাড়া দিয়া বনলতার অজ্ঞাতসারে অমূল্য তাহাকে এই ঠিকানায় লইয়া আসিতে বলিয়াছিল। অমূল্য হাত ধরিয়া বনলতাকে গাড়ী হইতে নামাইল। বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া বনলতা দেখিল যে,

এবাড়ী এবং এরাস্তা তাহার অপরিচিত। ‘এ আমায় কোথায় আন্‌লেন অমূল্যদা’, বলিবার পূর্বেই অমূল্য একরূপ কোলে করিয়া বনলতাকে বাড়ীর মধ্যে আনিল। বাড়ীতে ঢুকিয়াই সে তাহার পেছনের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। গাড়োয়ানের এরূপ অনেক দৃশ্য দেখা আছে, সে বাড়ীর নম্বরটা ভাল করিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি পাড়ী হাঁকাইয়া দিল। অমূল্য দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতেই বনলতা অমূল্যর পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, “আমার সর্বনাশ করবেন না অমূল্যদা, আমি আপনার বোন, আপনার গ্রামের মেয়ে আপনি আমায় দিদির বাড়ী রেখে আসবেন, চলুন।” অমূল্য তাহার কথার উত্তর দিল না, সে উচ্চকণ্ঠে দোতালার দিকে তাকাইয়া ডাক দিল, “মাসীগো, ওমাসী, দেখ দেখ, তোমার জন্তে কি এনেছি!” মাসী-নাসী স্ত্রীলোকটা সাড়া দিল,—কে অমূল্য নাকি, দাঁড়া বাছা যাচ্ছি নীচে।’ স্বরা-স্থলিত-কণ্ঠে স্ত্রীলোকের হারমোনিয়াম সহযোগে গান, মাঝে মাঝে অঙ্গীল প্রেমনিবেদনের টুকরা, তাহার উপর “মাসীর” কণ্ঠস্বর শুনিয়া বনলতা বুঝিল, সে নারী-মেধের নরকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অমূল্যর ডাক দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে একটা কৃষ্ণবর্ণা মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক নীচে নামিয়া আসিল, বনলতা বুঝিল,—এই-ই মাসী। অমূল্য ও মাসী তাহাকে একরূপ জোর করিয়া উপরে উঠাইল। ক্রন্দননিরতা বনলতাকে মাসী সাঙ্ঘনা দিতে লাগিল, “কেঁদোনা বাছা, কেঁদোনা; প্রথম প্রথম সব মেয়েরই এখানে খারাপ লাগে, তার পর আবার ভাল লাগে। অমন চাঁদের মত মুখখানি তোমার, দুদিনেই তোমার ধন দৌলত কে খায় তার ঠিক থাকবে না, অমূল্যর সঙ্গে কি কম বাবুর আলাপ আছে!” মাসীর সাঙ্ঘনা-বাণী শুনিয়া তাহার মনে হইল কে যেন তাহার কানে তপ্ত তরল বিষ ঢালিয়া দিতেছে। দোতালায় বারান্দার ধারে ধারে অনেকগুলি

ঘর, মাসী বনলতাকে তাহারই একখানা দেখাইয়া দিয়া বলিল,—
‘ওই ঘরটা তোমার বাছা, যাও এখন ঘরে যাও, আমাদের বশে
থেকো, তোমার কোন কষ্ট হবে না।’ বনলতা ঘরে ঢুকিয়াই আর
কেহ সেখানে প্রবেশ করিবার পূর্বেই ভিতর হইতে গিল লাগাইয়া
দিল। অমূল্য বিরক্ত হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল, মাসী তাহাকে
নিবৃত্ত হইতে বলিয়া বাহির হইতে ঘরে একটা তাল লাগাইয়া
দিল। মাসী অমূল্যকে বুঝাইল,—নূতন শিকার, বশে আনিতে কিছু
ধৈর্যের প্রয়োজন। অমূল্য হতাশ হইয়া মাসীর সঙ্গে চলিয়া গেল।
নির্জ্জন অন্ধকার রুদ্ধদ্বার ঘরে বসিয়া বনলতা ভাবিল,—এই মাতুষ
অমূল্য, ইহার উপরে বিশ্বাস করিয়া সে কেন ঘরের বাহির
হইয়াছিল!

সে রাত্রিটা বনলতাকে অনাহারে কাটাইতে হইল। সে ঠিক
করিল, কলঙ্কিত জীবন যাপনের পূর্বে মৃত্যুকে সে বরণ করিবে।
পরের দিন প্রাতে অমূল্য ও মাসী দুইজনেই দরজা খোলার জন্ত
সাধাসাধি করিল, বনলতা কিছুতেই দরজা খুলিল না, দরজা খুলিলেই
বিপদ নিশ্চিত ইহা সে বুঝিতে পারিল। বাড়ীর অগ্র অধিবাসিনীরাও
কৌতূহলী হইয়া তাহাকে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল,—একজন
একটু হাসিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল,—‘আমরাও অমনি সতী ছিলাম
লো, আর দুদিন সবুর কর, তারপর ওরই কাণ্ড দেখিস্!’ সেদিনটাও
বনলতা কিছু খাইল না। সে মনে মনে ঠিক করিল, কড়িকাঠে
কাপড় আটকাইয়া আত্মহত্যা করিবে। দুপুর রাত্রে সকলে ঘুমাইলে
আত্মহত্যা করিবে, ইহাই সে ঠিক করিয়া রাখিল। মরণ জিনিষটাকে
তাহার বড় ভয় করিত, এখন মনে হইল, এমন ঘণিত জীবন
যাপনের অপেক্ষা মরণ ঢের ভাল! সারাদিনের ক্লান্তিতে,
হুত্বাবনায় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল

তখন সমস্ত বাড়ীটা নিশ্চর হইয়া গিয়াছে। এই উপযুক্ত অবসর ভাবিয়া বনলতা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাঁদের আলোতে তাহার মনে হইল, জানালার ধারে বারান্দায় কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। বনলতাকে উঠিতে দেখিয়া সে বলিল,—‘এই শোন, জানালার ধারে এসে দাঁড়া।’ বনলতা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, মেয়েটিকে সকালে সে কোতুল্লী মেয়েদের দলে দেখিয়াছে। মেয়েটি জানালার গরাদের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া একটা পাউরুটি বনলতার হাতে দিয়া বলিল,—‘হুদিন কিছু খাস্নি, চিবিয়ে খা, সব ঘুমিয়েছে দেখে এলাম। তুই পালাবি?’ মেয়েটির সমবেদনাপূর্ণ কথা শুনিয়া বনলতার মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল, পালানোর কথা শুনিয়া ভীকু চোখ তুলিয়া বলিল,—‘কোথায় পালাবো ভাই, কেমন করে পালাবো?’

মেয়েটি বলিল—“কল্কেতায় তোর জানা কোন লোক আছে, তার ঠিকানা জানিস্?”

বনলতা বলিল—“হ্যাঁ আছে।” মেয়েটি ব্লাউসের নীচে হইতে একটা পোষ্ট কার্ড ও পেন্সিল বাহির করিয়া বনলতার হাতে দিয়া বলিল,—“দিনের বেলা চুপি চুপি লিখে রাখিস্, কাল রাত্রে এমনি সময় আমি ওটা তোর কাছে নিয়ে যাব, ফেলারও ব্যবস্থা করব, বুকেছি তুই ভাল মেয়ে, তাই তোকে বাঁচাতে চাই, আমার কথা যেন কাউকে বলিস্ নে।” বনলতা পোষ্টকার্ড ও পেন্সিলটা রাখিয়া দিল, তাহার মনে হইল,—এই নরকেও এমন মানুষ আছে! হয়ত এই মেয়েটি তাহারই মত অবস্থা বিপর্যয়ে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। মেয়েটি চলিয়া যাওয়ার পর বনলতা ভাবিল, দেখা যাক্, চিঠি লেখার ফল কি হয়, মরণ ত তাহার হাতেই।

(২১)

ইহার দুই দিন পরে কলেজ হইতে ফিরিয়া অশোক একথানা পোষ্ট-কার্ড পাইল, পেন্সিলে লেখা চিঠি—লিখিয়াছে বনলতা, সহরের একটা পতিতা পল্লী হইতে। চিঠিটা পাইয়া অশোক চম্কাইয়া উঠিল। বইগুলি টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া সে সোজাই চলিল অবলারক্ষা আশ্রমের দিকে।

অবলারক্ষা আশ্রমের সেক্রেটারী মহিমারঞ্জন বাবুর সঙ্গে তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল,—ভদ্রলোক বন্ধ বয়সে বহুশ্রমে অভাগিনী নারীদের আশ্রয়স্থানটা গড়িয়া তুলিয়াছেন। যৌবন কালে তিনি ছিলেন উগ্র-রকমের রাজনীতিক। বিগত কুড়ি বৎসর যাবৎ রাজনীতি ছাড়িয়া দিয়া তিনি এই দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। সরল-শ্রদ্ধাশীল-কর্তব্যপরায়ণ-ধার্মিক ঋষিকল্প মানুষটা সকলশ্রেণীর লোকেরই শ্রদ্ধা-ভাজন। সৌভাগ্যক্রমে ভদ্রলোক তখন আশ্রমেরই আপিসে বসিয়াছিলেন, অশোককে দেখিয়া তাঁহার মুখ নির্মলহাস্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অশোককে তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন,—বলিলেন—‘কিহে নেতা, খবর কি, তুমি আবার আমার কাছে কেন?’

অশোক বনলতার চিঠিখানা তাঁহার হাতে দিল। বনলতার সহিত তাহার সম্পর্ক ও তাহার কতখানি দায়িত্ব, তাহা সে মহিম বাবুকে বুঝাইয়া বলিল। ক্ষণেকের মধ্যে মহিম বাবুর মুখের হাসি চলিয়া গেল, গম্ভীর মুখে তিনি বলিলেন,—‘চল, একবার থানায় যাওয়া যাক্, এসব ক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য অপরিহার্য্য।’ সময় বাঁচাইবার জন্ত তাঁহার একটা ট্যাক্সি ডাকিলেন। মহিমবাবু থানার সকলের সুপরিচিত। কতবার তিনি এইসব অফিসারদের সাহায্যে কত মেয়েকে পতিতালয় ও অন্তঃস্থান হইতে উদ্ধার করিয়াছেন!

মহিমবাবু থানার সাব-ইন্সপেক্টরকে ব্যাপারটা বলিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকজন পুলিশ লইয়া সজ্জিত হইয়া বলিলেন,—“চলুন!”

অশোক দলবল সহ সম্মার দিকে নিদিষ্ট বাড়ীতে পৌঁছিল। একটা ঘর হইতে তালা ভাঙ্গিয়া বনলতাকে বাহির করা হইল। অশোককে দেখিয়া বনলতা তাহার পায়ের কাছে আছাড় পাইয়া কাদিতে লাগিল। মহিমবাবু তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, “কৈদনা মা লক্ষ্মী, কৈদনা, আমরা যখন এসেছি তখন আর কোন ভয় নেই।” অনেক অনুসন্ধানের পরে অমূল্যকে পাওয়া গেল না—জানা গেল সে এখানে থাকেনা, যাওয়া আসা করে মাত্র। ‘মাসী’কে পুলিশ ধরিয়া থানায় লইয়া যাইবে শুনিয়া সে মড়াকান্না জুড়িয়া দিল। পুলিশ বাড়ীর অগ্রাগ্রহ অধিবাসীদের কাছে প্রশ্নাদি করিয়া মাসীকে থানায় লইয়া চলিল। অমূল্য ফিরিলে তাহাকে ধরিবার জন্য জনকয়েক পুলিশ মোতায়েন রহিল। সাব-ইন্সপেক্টর বলিলেন, ‘মহিমবাবু, মেয়েটিকে আপনারা কি আশ্রমে রাখতে চান?’ মহিমবাবু বলিলেন—‘তাছাড়া ও আর কোথায় যাবে বলুন।’

সাব-ইন্সপেক্টর বলিলেন,—‘তাই নিয়ে যান, আমাদের কোন দরকার হলে আপনার আশ্রমে খবর দেব।’ একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া মহিমবাবু বনলতা ও অশোককে লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। এই কয়দিন বনলতার উপর যে ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছিল তাহার ফলে তাহার মন সুস্থ ছিলনা, সে সারাপথ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শুধু একবার অশোককে জিজ্ঞাসা করিল,—“দিদি ভাল আছেন ত?” অশোক বলিল, “দিদি? দিদি ত এখানে নেই, তিনি নাগপুরের ওধারে আছেন। অমিতাভ সেখানে চাকরী করছে কিনা!” বনলতা বুঝিল, গৃহত্যাগ করিবার পূর্বে সে দিদিকে যে পত্র লিখিয়াছিল উহা তাহার হস্তগত হয় নাই। মহিমবাবু ও বনলতাকে আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া

অশোক বোর্ডিং এ ফিরিয়া আসিল, আজ আর বিশেষ কোন কথাবার্তা বলিবার প্রবৃত্তি কাহারও ছিলনা। অশোক আসিবার সময় মহিমাবাবু বার বার বলিলেন, পরের দিন একবার আসিতে, বনলতার ভবিষ্যৎ আলোচনা করিবার জ্ঞ।

পরের দিন সকালে অশোক আবার আশ্রমে আসিল। অশোক মহিমাবাবুকে বলিল, বনলতার সঙ্গে সে কয়েকটা কথা বলিতে চায়। পাশের ঘরে মহিমাবাবু বনলতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অশোক দেখিল, এখন আর কালিকার মত ভীক, চকিত দৃষ্টি বনলতার নাই, সে এক রাত্রের মধ্যে নিজেই অনেকটা আশ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অশোক ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইল, কি ভৎসহ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বনলতা গৃহত্যাগ করিয়াছে। হরিসাধনের মৃত্যুর পর সেই বনলতাকে ওখানে রাখিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে এসম্বন্ধে কোন সংবাদ না দেওয়ার জ্ঞ অশোক বনলতাকে ভৎসনা করিলে সে বলিল,—“দাদা, আপনার নাম কলঙ্কিত হবে বলে আমি আর আপনাকে নিজের কথা বলে বিব্রত কর্তে চাইনি। আপনি ছাত্র, এখনও স্বাধীন নন এই কথাই আমার মনে হয়েছিল।” অশোক বলিল তাহার নিকট সাহায্য লইতে সে যেন কোন দিন আর না আপত্তি করে। বনলতাকে সে বলিল, আপাততঃ এখানেই সে থাকুক, তাহার গান বাজনা লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা সে করিবে। অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের জ্ঞ প্রস্তুত হইতে সে তাহাকে সাহায্য করিবে।

মহিম বাবুর ঘরে আসিয়া বনলতার সম্বন্ধে অশোকের অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা হইল। বনলতার থাকিবার আর কোন স্থান নাই শুনিয়া মহিম বাবু বলিলেন, আপাততঃ সে এখানেই থাকুক। তবে দীর্ঘকাল তিনি উহাকে আশ্রমে রাখিতে পারিবেন না। বাঙ্গলা দেশে নারী-হরণের অভাব নাই, সমাজ-পরিত্যক্তা নারীরা

পবিত্র জীবন যাপন করিবে এমন আশ্রম, বাঙ্গলা দেশে এই আশ্রম ছাড়া খুব কম। একজনকে দীর্ঘকাল আশ্রমে রাখিলে অল্প প্রবেশাণী-দের ফিরাইয়া দিতে হয়। গান বাজনা লেখা পড়া শিখাইয়া মেয়েদের স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের পথ স্বগম করিয়া দেওয়াই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। ইচ্ছাদের মধ্যে যাহারা অল্পবয়স্ক এবং সুন্দরী তাহাদের ইচ্ছারা বিবাহ দিয়া থাকেন। বিবাহিত জীবনের একটা পবিত্রতা ও মর্যাদা আছে,—এই প্রতিষ্ঠা দেওয়ার সুযোগ পাইলে আশ্রম ইচ্ছা ত্যাগ করে না। মহিমবাবু অশোককে বলিলেন, সে যেন বনলতার জন্ত একটি পাত্রের সন্ধান করে, আশ্রম হইতেও চেষ্টা চলিবে ইচ্ছাও তিনি বলিলেন। অশোক মহিমবাবুকে বলিল, বনলতাকে গান বাজনা, সূচী-শিল্প ও লেখা-পড়া শিখাইবার জন্ত যেন একটু বিশেষ ব্যবস্থা হয়,—ইচ্ছার বায় সে নিজে স্ফলারশিপের টাকা হইতে দিবে। অশোক বড়লোকের ছেলে, টাকার তাহার অভাব নাই, এই জন্ত মহিমবাবু অশোকের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

আশ্রম হইতে বাহির হইয়া অশোক কয়েকটা সংবাদ-পত্রের কাগ্যালয়ে গেল। শিক্ষিতা-সুন্দরী-বালবিধবার জন্ত উদারমতাবলম্বী পাত্র আবশ্যক এই মন্মে বক্স নম্বর দিয়া কাগজগুলিতে বিজ্ঞাপন দিয়া সে বাসায় ফিরিয়া আসিল। বিজ্ঞাপনদাতা হিসাবে সে মহিমবাবুর নাম ও ঠিকানা দিয়া আসিল।

(২২)

গ্রীষ্মের ছুটি হইতে আর বেশী দেরী নাই—, কলেজে ছাত্রদের উপস্থিতি-সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। পার্সেণ্টেজ স্ট পড়া ছাত্রেরা ছাড়া আর প্রায় সকলেই বাড়ীর দিকে যাত্রা করিয়াছে, এমন সময়

একদিন অশোকের ছাত্রসংঘের সভাপতির নিকট ডাক পড়িল। সেখানে গিয়া শুনিল, পশ্চিম বঙ্গের একাংশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন, সরকারী সাহায্যও দেওয়া হইতেছে, কিন্তু বাহির হইতেও সাহায্যের প্রয়োজন। অশোক দুর্ভিক্ষের কথা সংবাদ-পত্রেও পড়িয়াছিল এবং তাহাদের যাওয়া প্রয়োজন একথাও মনে হইয়াছিল। কিন্তু বনলতার ব্যাপারে বিব্রত হইয়া পড়ায় আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সভাপতির ইচ্ছামত সে কলিকাতা হইতে চাউল, বস্ত্র ও কম্বীদল লইয়া রওনা হইয়া গেল।

ই-আই-রেলের ব্রাঞ্চ লাইনের একটা স্ট্রুপ স্টেশন হইতে নামিয়া প্রায় মাইল কুড়ি দূরে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল। এখানে আসিয়া অশোক যে দৃশ্য দেখিল তাহা বলিবার নহে। সাহায্য-কেন্দ্রখোলার পরদিন হইতে তাহাদের কেন্দ্রে শত শত দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারী আসিয়া জমা হইতে লাগিল। ইহাদের অস্থি-কঙ্কাল-সার দেহ জীর্ণ বসন স্নান মুখ দেখিয়া অশোকের মনে হইল এই আমাদের দেশের লোক— ইহাদের লইয়াই আমাদের ধর্ম রাষ্ট্র ও সমাজ। সাহায্য-প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চ বর্ণের এবং রমণীর সংখ্যাও কম ছিল না। কলিকাতা হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবকেরা দেখিয়া বিস্মিত হইল—এই লোকগুলি একসের করিয়া চাউল পাটবা মাছ উহা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে চিবাউয়া খাইতেছে।

এই অঞ্চলে জলাভাব হেতু অজন্মা লাগিয়াই থাকে। জমিতে যে সামান্য ধান হয় সাধারণ মানুষের ইহাতে বেশী দিন চলেনা, বৎসরের বাকী কয়মাস ধানের উপর চালাইতে হয়। তাহার উপর ম্যালেরিয়া, জমিদারের খাজনা, কল্যার বিবাহ, গৃহদাহ প্রভৃতি ত আছেই। এবার একেবারেই ধান হয় নাই, এইজন্য একটু শীঘ্র শীঘ্র লোকের অভাব দেখা দিয়াছে।

সরকারী কর্মচারীদের এবং কংগ্রেসের সাহায্য কেন্দ্রগুলি থাকা সত্ত্বেও অশোকদের কেন্দ্রে যথেষ্ট ভিড় হইতে লাগিল। অশোকের মনে হইল এই সময় আর দশ বারটী সাহায্য কেন্দ্র খুলিলেও কাজের অভাব হইবে না।

বর্ষাকাল পর্যন্ত অশোক ওপান হইতে নড়িতে পারিল না। বধা পড়িলে তাহারা আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। এই তিন-চারিমাসের গুরু পরিশ্রমে তাহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কলিকাতায় আসিয়া সে প্রথমে তাহাদের সভাপতির সহিত দেখা করিল। তিনিও দীর্ঘকাল তাহাদের সঙ্গে সাহায্য কেন্দ্রে ছিলেন। বৃদ্ধ মানুষ পশ্চিম বঙ্গের দারুণ গরম সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি কিছু আগেই কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি অশোককে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং এই তিনমাস সে যে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছে, তাহার জ্ঞাত প্রাণ-ভরিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন, বলিলেন—“আমরা জনকয়েক বুড়ো বেঁচে আছি. আমাদের দেশের হতভাগা লোকগুলোর জ্ঞাত। এবার তাদের ভার তাদের মত ছেলেদের হাতে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত মরতে পারবো।”

ইহার পর অশোক মহিম বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। মহিমবাবু ছিলেন তাহার বাড়ীতে। মহিমবাবুকে সে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বনলতার বিবাহের বিজ্ঞাপনের বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। দুইজন লোক খোঁজ লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু আশ্রমের মেয়ে বলিয়া বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, তিনি বনলতাকে দেখিয়া খুব পছন্দ করেন. তবে বিবাহে তাহার আপত্তি, মেয়েটাকে তিনি কিনিয়া লইতে চান। প্রস্তাব শুনিয়া মহিমবাবু তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করিয়াছিলেন।

অশোকের মনে হইল, এই বিস্তৃত বাঙ্গলা দেশে এমন কোন সন্মুখ যুবক কি নাই, যে এই মেয়েটাকে বিবাহ করিয়া আশ্রয় দিতে পারে ! বনলতা রূপবতী, আশ্রম তাহাকে চিরকাল আশ্রয় দিবে না। স্বাধীন-ভাবে জীবিকার্জন হয়ত সে করিতে পারিবে,—কিন্তু রূপের জগৎ শাস্তি সে পাইবে না হয়ত অম্লার মত লোকের হাতে পড়িয়া তাহার দুর্দশার আর সীমা থাকিবে না। বনলতা তাহার বন্ধুর বিধবা স্ত্রী, তাহার যে অল্প কোন লোকের সঙ্গে বিবাহ হইবে এই চিন্তা তাহার পক্ষে প্রীতিপদ ছিল না, তথাপি সে বনলতার বিবাহে সম্মতি দিয়াছিল। কারণ ইহা হইতে শ্রেয়ঃ পথ আর তাহার পক্ষে ছিল না। অনেক চিন্তার পর সে মহিমাবাবুর সম মতাবলম্বী হইতে পারিয়াছিল। মহিমাবাবুর অন্তমতি লইয়া সে আশ্রমে গিয়া বনলতার সঙ্গে দেখা করিল। অশোক দেখিল, বনলতার বেশ ও বচনবিজ্ঞাস এষ্ট কয় মাসেই বেশ পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া অশোকের বেশ গভীর বলিয়া মনে হইল। পড়াশুনা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আবশ্যক প্রশ্নাদি করিয়া অশোক বিদায় লইল। আসিবার সময় বনলতা বলিল, “আর একদিন আসবেন দাদা, কতদিন পরে আপনাকে দেখলাম! আর এবার শাড়ী যাবেন, কাকীমা অনেকদিন আপনাকে দেখেন নাই।” অশোকের মাকে সে কাকীমা বলিয়াই সম্বোধন করিত, যদিও সে কোনদিন তাঁহাকে দেখে নাই। অশোক দুই একবার ভাবিয়াছিল বনলতাকে তাহাদের বাড়ীতে রাখিয়া আসিবে। বনলতা অনাখীয়া যুবতী—এই যা আপত্তি। এইজন্য সে একথা তাহার বাবা কিম্বা মাকে বলিতে পারে নাই। অশোকের মা তাহার নিকট বনলতার সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি উচিত মনে করিলে নিজে হইতেই বনলতাকে বাড়ীতে আনিবার কথা তুলিতেন। বনলতাকে তিনি চিঠি লিখিতেন, টাকা পাঠাইতেন

কিন্তু ওকথা যখন কোনদিন তুলেন নাই তখন তাহার মত হইবে না মনে করিয়া এই চিন্তা অশোক মন হইতে দূর করিয়াই দিয়াছিল।

(২৩)

সেবা-সজ্জের তরফ হইতে বস্তি অঞ্চলে একটি নাইট স্কুল খোলা হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গ হইতে ফিরিয়া অশোক দেখিল স্কুলের কাজে নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। বর্তমানে তাহার হাতে অন্য কাজ না থাকায় সে স্কুলটিতে মনোযোগ দিল। স্কুল খোলার সময়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্ত একটি গ্যারিং ম্যানস্ ইনষ্টিটিউটও খোলা হইয়াছিল, কিন্তু উচ্ছোক্তাদের উৎসাহ ম্লান হইয়া যাওয়ায় এটা মরিতে বসিয়াছিল—অশোক এটির ভারও গ্রহণ করিল।

অশোকের আর এক কাজ হইল বনলতার জন্ত একটি পাত্র অনুসন্ধান করা। তাহার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যাহারা নিজেদিগকে জাতিভেদ-বিরোধী, সংস্কার-পন্থী, উদারমতাবলম্বী বলিয়া প্রচার করিত, অশোক তাহাদের অনেককেই অনুরোধ করিল—বনলতাকে বিবাহ করার জন্ত। অশোক দেখিল ইহারা মুখে যতই বড়াই করুক না কেন, ইহাদের নৈতিক সাহস এবং ঔদার্য্য সন্ধীর্ণ-সীমার মধ্যে আবদ্ধ। লতাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব ইহারা হাসিয়া উড়াইয়া ত দিলই, উপরন্তু, বনলতার সহিত অশোকের সম্বন্ধ লইয়া কুৎসিত রহস্য করিতেও ছাড়িল না। অশোক এইসব বন্ধু-বান্ধবদের শ্রদ্ধা করিত, কিন্তু কাৰ্য্যকালে ইহাদের স্বরূপ দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইল। সে মনে মনে ভাবিল, ইহাদের কথায় ও কাজে এমন বিশ্বাসকর অসামঞ্জস্য

কেন ? ইহারা কি সমস্ত পৃথিবীটাকে স্কুলের ডিবেটিং ক্লাব বলিয়া মনে করে ?

আদর্শবাদী অশোক স্তম্ভবিধাবাদের মর্ম অবগত নহে । আদর্শবাদীদের স্বপ্ন এমনই করিয়াই তিলে তিলে চূর্ণ হইয়া যায় ।

পূজার ছুটির পর অশোক পড়াশুনায় মন দিল । দুই বছর ভাল করিয়া সে পড়ে নাই, শুধু সজ্জের কাজে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, সেকেণ্ড ক্লাস অনার্সটা অন্ততঃ তাহাকে পাইতে হইবে । কোনরূপে বি-এটা পাশ করিতে পারিলে আবার গ্রাম-উন্নয়ন প্রভৃতি পরিকল্পনাগুলি কাষ্যকরী করার চেষ্টা সে করিবে ।

পূজার পর সে কিছুদিন বেশ পড়াশুনা করিল । অমিতাভদের পত্র লেখা ও মধ্যে মধ্যে আশ্রমে গিয়া বনলতার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আসা ছাড়া সব সময়টাই সে লেখাপড়ায় ব্যস্ত করিতে লাগিল । তাহার মনে হইল, কিছুদিন এভাবে পড়িলে প্রথম শ্রেণীর অনার্স একটা হয়ত সে পাইয়াও যাইতে পারে ।

টেস্ট পরীক্ষা সে দিল ভালই । টেস্টের পর ফিস্ দাখিল করিয়া হোষ্টেলে ফিরিতেই সে একথানা টেলিগ্রাম পাইল—তাহার বাবার, “Mother seriously ill. Start immediately” কাল বিলম্ব না করিয়া অশোক যাত্রা করিল ।

বাড়ী গিয়া দেখিল তাহার মার ১০।১১ দিন যাবৎ জ্বর । ডাক্তার টাইফয়েড বলিয়া গিয়াছেন । সামান্য জ্বর, দুদিনেই সারিয়া যাইবে, পরীক্ষার সময় তাহার পড়ার ব্যাঘাত করিয়া কাজ নাই বলিয়া মা অস্থগের কথা এতদিন জানাইতে দেন নাই । জ্বর যখন দুইএকদিনে ছাড়িল না এবং টাইফয়েডে পরিণত হইল কিরণ বাবু তখন আর অশোককে খবর না দেওয়া উচিত মনে করিলেন না ।

অশোক আসার পর তাহার মায়ের অস্থখ আরও বাড়িতে লাগিল ।

গ্রামের ডাক্তারের পরামর্শক্রমে কলিকাতা হইতে দৈনিক একশত টাকা ভিজিটের এক মাঝাপি ডাক্তার আসিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অশোকের কোলে মাথা রাখিয়া ৩১ দিনের দিন তাহার মা মারা গেলেন।

মায়ের মৃত্যু শোকে অশোক একেবারে মুহমান হইয়া পড়িল। মায়ের মৃত্যুর পর প্রথম সপ্তাহটা তাহার কাটিল একেবারে আচ্ছন্নের মত,—নিজের অস্তিত্বই সে সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাইত। আঘাত যতই গুরু হউক তাহাকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইল—তাহার মায়ের আত্মার জন্ত। তাহার বাবারও সে আঘাতটা যে কম লাগে নাই, ইহা তাঁহার ভাব লেশ হীন মুখের দিকে তাকাইলেই বেশ বুঝা যায়।

শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হইলে অশোকের অন্তর একেবারে শূণ্য মনে হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল তাহার মায়ের চিতার আগুনে তাহার সমস্ত আদর্শ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। অশোকের সাধনার প্রেরণাদাত্রী ছিলেন তিনি। মানুষের মত মানুষ হইয়া মায়ের চরণপ্রান্তে যে দিন আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে,—সে শুধু সেইদিনের প্রতীক্ষা করিত। আজ মা চলিয়া গেলেন—কাহার জন্তই বা সে আর সাধনা করিবে। শূণ্যগৃহ তাহার অসহ্য ঠেকিতেছিল—তাহার বাবারও। তাঁহার ইচ্ছা অশোককে কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়া কিছুদিন তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিবেন।

অশোককে সঙ্গে লইয়া কিরণবাবু কলিকাতায় তাহাকে তাহার বোর্ডিং এ রাখিয়া আসিলেন।

পরীক্ষার আর বড় বেশী দেরী নাই। পরীক্ষা দিতে অশোক একেবারে অনিচ্ছুক। তাহার মনে হইল, এই তো মানুষের জীবন, আজ যে ঝাঁচিয়া আছে, কাল সে ঝাঁচিয়া যাকে না, কি হইবে কতকগুলি

পুঁথি মুগ্ধ করিয়া! সে যে পরীক্ষা দিতে চায় না একথা শুনিয়া কিরণবাবু বলিলেন, “মিছামিছি একটা বছর কেন নষ্ট করবে বাবা, শুধু বসে থাকলে মন আরও খারাপ লাগবে, তাছাড়া আমার আর্থিক অবস্থাও আর তেমন স্বচ্ছল নয়। তুমি দত্ত শীঘ্র লেখাপড়া শেষ করতে পার ততট ভাল।” অশোক দেপিল তাহার বাবা যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যই—এ সময় মনকে কোন একটা কাজে ব্যাপ্ত রাখা আবশ্যক। সে আবার পুঁথি-পত্র খুলিয়া বসিল। অশোক পড়া-শুনায় মন দিয়াছে দেপিয়া কিরণবাবু কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। একটা তীর্থযাত্রী স্পেশাল ট্রেনের টিকিট তিনি আগে হইতেই কিনিয়া রাখিয়াছিলেন।

(২৪)

পরীক্ষা শেষ হইলে অশোক একদিন হাওড়া স্টেশনে গিয়া নাগপুর-গামী ট্রেনে উঠিয়া বসিল। তাহার মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া অবদি সে অমিতাভদের চিঠি পাইতেছে—পরীক্ষা শেষ হইলেই সে যেন তাহাদের ওখানে কিছুদিন কাটাইয়া আসে। দিদির চিঠি সে সপ্তাহে একবার করিয়া পায়—তাহাতেও ঐ একই কথা, তাহাদের কাছে যাইবার সনির্বন্ধ অনুরোধ। অশোক এ অনুরোধ কিছুতেই এড়াইতে পারিল না। তাছাড়া এই অবস্থায় প্রিয়জনদের সামিধ্য লাভ করার একটা তীব্র আগ্রহ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। মায়ের মৃত্যুতে মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে, দিদিদের স্নেহের প্রলেপে হয়ত তাহা কিছু আরোগ্য লাভ করিতে পারে, এই আশায় সে যাত্রা করিল।

অমিতাভ যেখানে থাকে সে স্থানটার নাম সীতাপুর। “ওই অঞ্চলে লোকের বসতি কম। সংলগ্ন বিস্তৃত অরণ্যভূমি সীতাপুরা হইতে

স্থানটার নাম ঐ হইয়াছে। নাগপুর হইতে স্থানটা প্রায় দুইশত মাইল দূরে। নাগপুর হইতে খানিকটা ট্রেনে যাইয়া বাস পরিতে হয়। তারপর বাস হইতে নামিয়া বাকী বিশ মাইল পথ ঘোড়ার কিয়া গরুর গাড়ী করিয়া সীতাপুরা যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে তিন দিনের পথ।

সোমবার প্রভাতে যাত্রা করিয়া বৃহবার বৈকালের দিকে অশোক অমিতাভর বাংলোর আসিয়া পৌছিল। জায়গাটার নিৰ্জনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অশোককে মুগ্ধ করিল। বহুকাল পরে অশোককে পাইয়া অমিতাভদের মনে অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল। অশোক শোকক্লিষ্ট। অমিতাভ, দিদি ও লেখা তিনজনে মিলিয়া তাহার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাদের আন্তরিকতায় অশোকের মনে কিছুদিনের মধ্যেই পূর্বতন শান্তি কতকটা ফিরিয়া আসিল।

অমিতাভর সঙ্গে বনে বনে ঘুরিয়া, বই পড়িয়া, দিদি ও লেখার সম্মেহ আতিথেয়তায় তিনমাস কোথা হইতে যে কাটিয়া গেল, তাহা অশোক ধারণায় আনিতে পারিল না। ইহারই মধ্যে সংবাদ আসিল, অশোক অনার্স পাইয়াছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর উপর দিকে। অশোক ইহা অপেক্ষা আর ভাল ফল আশা করে নাই—কারণ মায়ের মৃত্যুর জন্ত পড়াশুনা সে মোটেই ভাল করিয়া করিতে করিতে পারে নাই। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে অশোক কলিকাতা যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে কম্বী মানুষ—এতকাল বিশ্রাম লাভকরা তাহার ভাগ্যে কখনও হয় নাই। অমিতাভদের প্রবল আপত্তি তাহাকে জুলাই-এর পূর্বে যাইতে দিতে। অশোক যাইতে চায়, অমিতাভরা যাইতে দিবে না, এমন সময় অশোক মহিমাবাবুর এক টেলিগ্রাম পাইল,—“বনলতার বিবাহ, শীঘ্র এস, অপর সাক্ষাতে

জ্ঞাতব্য।” বনলতার বিবাহের কথা দিদির বিশেষ মনঃপূত হইল না। তিনি বলেন, দ্বীলোকের একবার মাত্রই বিবাহ হইতে পারে! কোন পুরুষের অভিভাবকত্ব ব্যতিরেকে অল্পবয়স্ক মেয়েদের দুর্গতির আর সীমা থাকেনা। এই দুর্গতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে বনলতার মত মেয়ের ভাগ্যে বিবাহ ছাড়া আর উপায় নাই। একবার দুঃশরিত্র লোকের হাতে পড়িয়া তাহার সঙ্কনাশ হইতে বসিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার লোক না থাকিলে আবার তাহার এই দুর্গতি হইবে না, কে বলিতে পারে? সেবার বড় ভাগ্যে সে রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু বার বার সে নিজের দর্শ্য রাখিতে সক্ষম হইবে কি! অমিতাভও অশোকের অকাটা যুক্তি দিদির হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি বুঝিলেন, বনলতা ভাগ্য-চক্রের আবর্তনে যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—তাহাতে কেহ তাহাকে বিবাহিতা দ্বীর মর্যাদা দিলে তাহার পক্ষে উহা বরণীয় হইবে। অনেক চিন্তার পর তিনিও বনলতার বিবাহে সম্মতি দিয়া মনে মনে বলিলেন, আহা দুঃখিনী মেয়েটি যেন এবার স্থখী হয়! অশোক যাইবার সময় দিদি বার বার করিয়া অনুরোধ করিলেন, সে যেন ছুটি পাইলেই তাঁহার কাছে আসে। বনলতার বিবাহ-সংক্রান্ত সকল সংবাদ কলিকাতা ফিরিয়া গিয়া তাহাকে জানাইতে বলিতেও তিনি ভুলিলেন না।

(২৫)

হাওড়া স্টেশন হইতে অশোক সোজা একেবারে মহিমবাবুর বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। সে জানিত এই সময়টা মহিমবাবু বাড়ীতেই থাকেন। মহিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া অশোক জানিল, বনলতার জন্ত নির্ধারিত পাত্রটি একজন সিন্ধী যুবক। বয়স তাহার ২৭২৮ বৎসর

এখনও অবিবাহিত, সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান। আশ্রমের দুই একটা মেয়ের বিবাহ মহিমবাবুর চেষ্টায় ঐ দেশেই হইয়াছে। বিবাহ যোগ্য কণ্ঠার অনুসন্ধানে যুবকটা আশ্রমে আসিয়াছিল, বনলতাকে দেখিয়া তাহার পছন্দ হইয়াছে, তাহার পূর্ব ইতিহাস সবই তাহাকে বলা হইয়াছিল, তাহাতে গণেশজীর (যুবকটার ঐ নাম) কোন আপত্তি নাই। গণেশজীর অবস্থা ভাল, দেশে তাহার ব্যবসা আছে—এই উপলক্ষে সে প্রায়ই কলিকাতায় আসে। গণেশজীর সম্বন্ধে ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়াই মহিমবাবু এই বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন। আশ্রমের মেয়েবা তাঁহার নিজের কণ্ঠার মত, যার তার হাতে তিনি তাহাদের বিলাইয়া দিতে পারেন না।

অশোক মহিমবাবুর নিকট সকল সংবাদ পাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। মহিমবাবুর তার পাইয়া অশোক ভাবিয়াছিল, কোন সহন্য বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গেই বুঝি বনলতার বিবাহ। বাঙ্গালীর মেয়ে বনলতা—সে ধাইবে দূর সিদ্ধদেশে এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে ঘর করিতে, এ প্রস্তাবে তাহার মন বিশেষ আনন্দিত নয়। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, মহিমবাবু—যিনি এই শ্রেণীর মেয়েদের জগৎ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তিনি—তাহার অপেক্ষা বনলতার অল্প হিতৈষী নহেন। তিনি যখন এ বিবাহের সমর্থক তখন আর তাহার আপত্তি করা উচিত নহে। তাছাড়া বনলতাকে বিবাহ করিতে চাহিবে এমন বাঙ্গালী ছেলে কোথায়? দেড় বৎসর ধরিয়া সে ও মহিমবাবু একটা বাঙ্গালী ছেলের অনুসন্ধানে কম অর্থ ও সময় ব্যয় করে নাই। বনলতা বিধবা, তাহার একটা জাতি আছে, পতিভালয় হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে আশ্রমে রাখা হইয়াছে, অতীত ইতিহাস হইতে বিস্মিষ্ট করিয়া তাহাকে নিজের গৃহিণীর পদে অভিষিক্ত করিবে, এমন মহাপ্রাণ যুবকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অশোকের নিজেরই

মথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিবাহযোগ্য পাত্র পাটলেই বিবাহ দিতে হইবে—
 আশ্রমের ইহাই বিধি। একজনকে দীর্ঘকাল ধরিয়া আশ্রমে
 রাখিলে, এই ধরণের অগ্নি মেয়েদের ফিরাইয়া দিতে হয়।
 যাহারা পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারিত ইহার ফলে
 তাহাদিগকেও বাধ্য হইয়া কলঙ্কিত জীবন যাপন করিতে
 হয়। ধরা যাউক—আশ্রম বনলতাকে রাখিল না; অশোক
 দরিদ্র নহে, লেখাপড়াও শিখিয়াছে, শীঘ্রই উপার্জনক্ষম হইবে,
 বনলতার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার না-হয় সে লইতে পারে। কিন্তু চিরকাল
 বনলতা তাহার আশ্রয়ে থাকিবে, ইহাতে উভয়েরই অশুভ সম্ভাবনা।
 অশোক বনলতাকে যতই স্নেহের চক্ষে দেখুক, সমাজ তাহাদের এই
 সম্বন্ধকে বিকৃত করিয়া দেখিতে ছাড়িবে না। উহা তাহাদের
 উভয়েরই পক্ষে অপ্রীতিকর ও লজ্জাজনক হইবে—ইহা বুঝিবার বয়স
 অশোকের হইয়াছে। এমনিই ত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বনলতার সঙ্গিত
 তাহার সম্বন্ধ লইয়া রসাল আলোচনা চলে। অশোক রূপে-গুণে-
 বিজ্ঞান-ধনে কাহারও চেয়ে ছোট নহে। এইজন্ত তাহার ঈর্ষাপরায়ণ
 শত্রুর অভাব নাই। তাহার ছিদ্রান্বেষণের লোকও অনেক আছে।
 অশোক ভাবে বনলতাকে আশ্রয় দিয়া কেন সে তাহার নিজের জীবনকে
 অশান্তিময় করিবে। গণেশজী বাঙ্গালী না হইলেও হিন্দু বৈষ্ণু,
 প্রাদেশিকতার কথা বাদ দিলে ধর্মের দিক হইতে আপত্তির কোন
 কারণ নাই। সকল দিক বিবেচনা করিয়া অশোক মহিমবাবুর মতে
 মত দিল। সে শুধু একবার মহিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—“কিন্তু
 এবিয়েতে বনলতার মত আছে ত?”

মহিমবাবু বলিলেন—আশ্রমের অগ্ন্যাগ্নি মেয়েদের উপর তিনি
 বনলতার মন বুঝিবার ভার দিয়াছিলেন। তাহাদের নিকট
 বনলতা বলিয়াছে, দাদা ও কাকাবাবু (মহিমবাবু) তাহার জন্ত

যাহা করিবেন তাহাই তাহার পক্ষে কল্যাণকর বলিয়াই সে বিশ্বাস করে।

অশোকের সম্মতি পাইয়া বিবাহের দিন পথ্যস্ত স্থির হইয়া গেল। শাস্ত্রীয় মতে শুভদিনে গণেশজীর সহিত বনলতার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের দিনে সকলের অগোচরে অশোক কয়েক গোট্টা চোখের জন ফেলিল—কিসের জ্ঞান তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। বিবাহের দিন গণেশজী আশ্রমের মেয়েদিগকে ভোজ দিলেন এবং আশ্রমে ২০০ টাকা সাহায্য করিলেন।

বিবাহের পরেও গণেশজীর কলিকাতায় আস্থানেক থাকার কথা। এই সময়টা সে তাহার স্ত্রীকে আশ্রম হইতে লইয়া গিয়া একটা ভদ্র-হোটেলে রাণিবাবু ইচ্ছা প্রকাশ করিল। মহিমবাবু তাহাতে সম্মতি দিলেন। বনলতাকে গণেশজী একটা ভাল হোটেলে লইয়া গেল। গণেশজী অমায়িক প্রাণখোলা মানুষ, অশোকের সহিত তাহার শীঘ্রই খুব বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল। অশোকের সব কথা মহিমবাবু ও বনলতার নিকট সে শুনিয়াছিল। তাহার স্ত্রী যে এতটা accomplished, এ শুধু অশোকের অর্থ-ব্যায়ে ও যত্নে এই কথা মনে করিয়া অশোকের প্রতি গণেশজীর কৃতজ্ঞতার আর সীমা ছিল না। প্রতিদিন বৈকালে সে অশোকের হোষ্টেলে গিয়া তাহাকে তাহাদের হোষ্টেলে টানিয়া আনিত। অশোক কোন দিন আপত্তি করিলে বলিত, “আপনি না গেলে আপনার বোন আগাকেই দোষ দেন, বলেন—তুমি দাদাকে ডাকিয়া আনিলেন কেন? আমরা ত চলে যাচ্ছি বাবুজী—এ কয়দিন আপনাকে দেখলে আপনাকে বোন মনে বড় শাস্তি পাবেন।” গণেশজীর আগ্রহে শত কাজ কেলিয়াও অশোককে তাহাদের হোষ্টেলে যাইতে হয়।

(২৬)

জুলাইয়ের প্রথমে ইউনিভার্সিটি ক্লাসগুলি খুলিয়া গেল। অশোক সাহিত্যের ছাত্র হইলেও ইতিহাসে তাহার অনুরাগ কম নহে। “প্রাচীন-ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি” বিভাগে এম-এ পড়িতে তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা। কিরণবাবু ইতিমধ্যে তীর্থ ভ্রমণ সারিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। অশোক তাঁহার অনুমতি চাহিলে তিনি লিখিলেন, অশোকের যদি ঐ বিষয়ে পড়িতে এত আগ্রহ তবে সে উহাই যেন পড়ে। কলেজ খুলিতেই অশোক ইউনিভার্সিটির ঐ বিভাগে প্রবিষ্ট হইল।

ক্রমে গণেশজীর দেশে ফিরিবার সময় আসিল। দেরাইসমাইল-খাঁ হইতে মাইল পঞ্চাশেক দূরে তাহার বাড়ী। নির্দিষ্ট দিনে, অশোক তাহাদের তুলিয়া দিতে হাণ্ডা স্টেশনে গেল। আজ সারাদিন অশোকের মন বড় বিষন্ন, বিষন্নতাকে প্রফুল্লতায় পরিণত করার জন্ত আজ সে সারাদিন ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। বনলতার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তাহারও চোখ ছল্-ছল্ করিতেছে।

ট্রেন ছাড়িতে আর মিনিট পাঁচেক দেয়ী। গণেশজী অশোককে বলিল,—“বাবুজী বোনের সাথে কথাবার্তা বোলে নিন্, আর পাঁচ মিনিট আছে ট্রেন ছাড়তে। আমার জানা আদমি যাচ্ছে ওদিকের গাড়ীতে আমি একটু দেখা করে আসি।” অশোক বুদ্ধিতে পারিল, গণেশজী বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাই বিদায়ের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে তাহাদের কিছুকাল একত্র থাকিতে দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। গণেশজী অগ্র একটা কামরায় গিয়া প্রবেশ করিল। বনলতাদের ইন্টার-ক্লাস টিকিট, কামরাটীও জনবিরল, অশোক কিছুক্ষণের জন্ত উহাতে উঠিয়া বসিল। বনলতা ছল্-ছল্ চোখে

বলিল, “দাদা, আমি হয়ত চিরদিনের জন্য বাঙ্গলা দেশ থেকে চল্লুম। মাঝে মাঝে অভাগিনী বোনকে দেখে এসো, নইলে হয়ত জীবনে আর দেখা মিলবে না।”

অশোক বহুকষ্টে মুখে হাসি টানিয়া বলিল,—“যাব বৈ কি, নিশ্চয়ই যাব তোমাকে দেখতে। এই পূজার ছুটিতেই যাব। আমাকে কিন্তু প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি দিও।”

ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা দিল, গণেশজীও আসিয়া হাজির। বনলতা নতজানু হইয়া অশোককে প্রণাম করিল, পায়ের উপর শীতল স্পর্শে সে বুকিল লতা কাঁদিতেছে। মাথায় হাত ঠেকাইয়া অশোক অল্পক্ষণে আশীর্বাদ করিল—“স্বখী হও বোন, স্বখী হও। আমি দুর্বল, আগার ক্রটি তুমি ক্ষমা করো।” বনলতার প্রণাম শেষ হইতে না হইতেই আর এক কাণ্ড—গণেশজীও অশোককে প্রণাম করিল। অশোকের সে ব্যয়োজ্যেষ্ঠ, অশোক সঙ্কচিত হইয়া আহা করেন কি বলিয়া তাহাকে ধরিয়া উঠাইল। গণেশজী হাসিয়া আধা বাঙ্গলা আধা হিন্দিতে বলিল,—“আপনি বাহ্মন আছেন বাবুজী, আউর হামারা স্ত্রীকা ভাই বি আছেন। কিন্তু আমায় আশিরবাদ ত কোরলেন না বাবুজী।” তাহার কথায় অশোক ও লতা উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। অশোক গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল, ট্রেন চলিতে শুরু করিয়াছে। গণেশজী ও লতা জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া অশোককে দেখিতে লাগিল। বাষ্পজলে অশোকের দৃষ্টি রোধ হইয়া আসিল। দ্রুতগামী ট্রেনের দিকে চাহিয়া অশোক মনে মনে বলিল,—“হায় বঙ্গমাতা, একটা দুঃখিনী মেয়ে তোমার শ্রামল কোলে আশ্রয় না পাইয়া সিন্ধুর উষর মরুভূমিতে দেশান্তরী হইয়া গেল—তুমি তাহাকে আশীর্বাদ জানাও! হে ভগবান, মেয়েটা সারাজীবন শুধু দুঃখ ও বঞ্চনা পাইয়াছে, এই বার তাহাকে তুমি স্বখী কর।”

টেনে যাইতে যাইতে বনলতা আসানসোল্ পযাস্ত ছুই চোথ ভরিয়া বাঙ্গলার শ্রামল সৌন্দর্য দেখিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, বিদায় বাঙ্গলা-মা বিদায়! আর কখনও তোমার বৃকে ফিরিব কিনা কে জানে!

(২৭)

অশোকদের ছাত্র-সেবাসঙ্ঘের বয়স প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল। প্রথম বৎসর কাজ হইয়াছিল বেশ ভাল, দ্বিতীয় বৎসরে কক্ষীদের উৎসাহ অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিল, কিন্তু অশোকের উৎসাহ ও দৃঢ়-চিন্ততার জগুই সঙ্ঘ অকাল মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া গেল। কারণ সে-ই ছিল সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক। সঙ্ঘের কয়েকটা কক্ষী রাজনৈতিক জগতের এক একটা ক্ষুদ্রে নেতা, ইহারাই সঙ্ঘের কাজে প্রথম ভাঙ্গন দরাইল। গ্রাম-উন্নয়ন, জনশিক্ষা, সেবা প্রভৃতি গঠনমূলক কাজে ইহাদের বিশেষ আস্থা নাই। ইহারা চায় বড় বড় কনকারণ হইবে, দেখানে সোসিয়েলিজম্, কমিউনিজম্ সম্বন্ধে গরম গরম বক্তৃতা চলিবে, পবরের কাগজে সেই সব বক্তৃতার অনুশিপি ও বক্তার প্রতিকৃতি ছাপা হইবে—ইত্যাদি।

অশোক এই ধরণের আন্দোলনের বিশেষ পক্ষপাতী নহে, ইহা লইয়াই তাহার সহিত ইহাদের হইল মতবিরোধ। সঙ্ঘের কাণ্ডে কয়েক হাজার টাকা জমিয়াছিল। এই টাকাটা লইয়াও তাহাদের সঙ্গে তাহার গুণগোল বাধিল। অশোক সঙ্ঘের সম্পাদক ও ধনরক্ষক। তাহার নিকট তাহারা এই টাকাটা দেশে মুভ্‌মেন্ট চালাইবার জগু চাহিয়া বসিল। অশোক বড় বিপদে পড়িল, ব্যক্তিগতভাবে সে টাকাটা এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার বিরোধী। ছাত্র-সেবাসঙ্ঘের যে কার্য-

তালিকা, তাহার মধ্যে এই ধরণের আন্দোলন চালাইবার কথা ছিল না। গাঁহার ছাত্র-সেবা-সঙ্ঘের কর্মতালিকা পড়িয়া টাকা দিয়াছেন, এই উদ্দেশ্যে টাকা ব্যয় করিলে তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। এক উদ্দেশ্যের জগ্ন সাহায্য চাহিয়া অপর কাণ্ডের জগ্ন তাহা ব্যয় করা নীতিশাস্ত্রের দিক দিয়াও অগ্রাঘ। সঙ্ঘের যিনি প্রেসিডেন্ট তিনিও একজন রাজনৈতিক নেতা, রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা করার অপরাধে তাঁহার প্রতি দীর্ঘকাল কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। প্রতিপক্ষের নেতাদিগকে টাকা দেওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ে পরামর্শ করার জগ্ন অশোক জেলে তাঁহার সহিত দেখা করিল। তিনিও এ বিষয়ে তাহার সহিত একমত হইলেন। অশোক এইবার তাহার বিপক্ষদলের নেতাদিগকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, প্রেসিডেন্ট তাহার মতেই মত দিয়াছেন, সে অগ্ন কোন আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে টাকা দিবে না। সঙ্ঘের কর্মীদের বাহিরেও তাহার শত্রুর অভাব ছিল না। অশোক কাহাকেও কখনও আঘাত করে না, তদ্ তাহার অনেক শত্রু। ইহাদের শত্রুতার কারণ ঈর্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাদেরই কেহ কেহ রটাইয়া দিল অশোক চৌধুরী সঙ্ঘের টাকা ভাঙ্গিয়াছে। খবরটা অবশ্য অশোকের কানে পৌছিল বহু পরে—সামনা-সামনি তাহাকে কিছু বলিবার সাহস কাহারও ছিল না।

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি অশোকের একদিন মনে হইল,—অনেক দিন সে তাহার বাবাকে দেখে নাই, মা মারা যাওয়ার পর বাড়ীও একবার যায় নাই। মায়ের মৃত্যুর শোক অনেকটা সহিয়া গিয়াছিল। বাড়ী গেলে পুরাতন শোক আবার নূতন করিয়া জাগিবে এ আশঙ্কাও তাহার মনে উঠিল। কুড়ি একুশ বৎসর মাত্র তাহার বয়স। এই বয়সে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সে অধিকারী। শিশুর মত শোকে

কাতর হওয়া কি তাহার মাজে! বাড়ী যাইবার ইচ্ছা হইতেই অশোক হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কাটিয়া বসিল। কয়েকদিন কলেজ কামাই হইবে তা হউক, বাবাকে একবার না দেগিয়া আসিলে তাহার মন শান্তি পাইতেছে না। এতদিন যে সে বাবাকে দেগিতে যার নাই এই আশ্চর্য! ছেলেকে দীর্ঘকাল না দেগিলে তিনিই বা থাকিবেন কেমন করিয়া! অশোকের পড়াশুনার ক্ষতি হইবে বলিয়া তিনি না হয় কর্তব্যের অনুরোধে অশোককে বাড়ী যাইতে লিখেন না, না লিখুন, কিন্তু অশোকের ত পিতার প্রতি একটা করুণা আছে।

বৈকাল চারটার সময় ট্রেন বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌছিল। এখানে ট্রেন অনেকক্ষণ থামে। অশোক প্লাটফর্মে নাগিয়া পায়েচাপি করিতেছে, এমন সময় বিপরীত দিক হইতে একখানি ডাউন ট্রেন আসিয়া থামিল। অশোক দেগিল, তাহাদের গ্রামের গোবর্দ্ধন দাস ট্রেন হইতে নামিতেছে। গোবর্দ্ধনের বর্দ্ধমানে একটা দোকান আছে, সে তাহা জানিত। সে গোবর্দ্ধনের কাছে গিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিল, “কি গোবর্দ্ধন বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি, গ্রামের সব ভাল ত?” গোবর্দ্ধন হেঁট হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বলিল, “কি ছোটকর্তা, নতুনমাকে দেখতে যাওয়া হচ্ছে বুঝি?” অশোক আকাশ হইতে পড়িল, নতুন-মা, নতুন-মা আবার কে! গোবর্দ্ধন চালাক লোক, অশোকের ভাবভঙ্গি দেগিয়া বুঝিল কিরণবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। গোবর্দ্ধনের নিকট জেরা করিয়া অশোক জানিল, মাস খানেক পূর্বে কিরণবাবু তাহারই কোন মহালের এক গোমস্তার প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন। বিবাহের পূর্বে কেহই ব্যাপারটা জানিতে পারে নাই। সংবাদ শুনিয়া অশোক মর্ম্মাহত হইল, কে যেন শপাং করিয়া তাহার পিঠে এক চাবুক

নারিল, মা-মা তাহার মায়ের মত গুণবতী রূপবতী স্ত্রী যাহার ছিল সেই ব্যক্তি কিনা কোথাকার এক গোমস্তার মেয়েকে পুনরায় পত্নীত্বে বরণ করিয়াছে! নিজের পিতার সম্মুখে অশোকের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। এ সংবাদ শুনিবার পর তাহার মন হইতে সেই ধারণা একেবারে মুছিয়া গেল, তাহার স্থান অধিকার করিল ঘৃণামিশ্রিত একটা তীব্র অভিমান। ওঃ! এইজন্য অশোককে তাহার বাবা আর বাড়ী হাইতে লেগেন না, দীর্ঘপত্রের বিনিময়ে আসে মনিঅর্ডার কুপনের সঙ্গে মাত্র দুটা লাইন! চিন্তামগ্ন অশোককে ফেলিয়া গোবর্দ্ধন ইতিমধ্যে সরিয়া পড়িয়াছে, কি জানি ছোটকর্তা আবার কি প্রশ্ন করিবে!

ট্রেন ছাড়িতে আর বিলম্ব ছিল না, অশোক কুলি ডাকিয়া জিনিষ-পত্রগুলি নামাইয়া লইয়া কলিকাতাগামী এক লোক্যাল ট্রেনে চড়িয়া বসিল। সে ঠিক করিল যতদিন সে বাঁচিয়া থাকিবে তাহার মাতার স্মৃতির যিনি অপমান করিয়াছেন, তাঁহার আর মুখ দর্শন করিবে না, তাঁহার দেওয়া অর্থও আর স্পর্শ করিবে না। সারাপথ সংবাদটা যেন তাহাকে দংশন করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার কিছু পরে সে তাহার বোডিংএ ফিরিল। তখনই সুপারিনটেনডেন্টের ঘরে গিয়া তাঁহাকে জানাইল, কালই সে এ হোষ্টেল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এ হোষ্টেলে থাকা ব্যয়সাধ্য, বাবুয়ানা করিবার মত সঙ্গতি তাহার আর নাই। সুপারিনটেনডেন্ট অশোককে পাঁচ বছর পরিয়া দেখিয়া আসিতেছেন। তিনি জানেন অশোক একবার ‘না’ করিলে তাহাকে আর ‘হাঁ’ বলান কঠিন, ভাবিলেন, বিশেষ কোন গুরুতর কারণ আছে। কারণটা হয়ত প্রকাশ্য নহে, এইজন্য তিনি আর তাহাকে পীড়াপিড়ি করিলেন না, বলিলেন,—“তোমার কাছে হোষ্টেলের কিছু ডিউজ আছে, ওটা মিটিয়ে দিয়ে যেও, হোষ্টেলের এই নিয়ম।”

সমস্ত রাত উত্তেজনায় অশোকের ঘুম হইল না। ভোর হইতেই তাহার মনে হইল হোষ্টেলের এই যে আরামপ্রদ আশ্রয় ইহা তাহার বাবারই করুণায় সে ভোগ করিতেছে—ইহা আজই ছাড়িয়া দিতে হইবে। সকাল হইতেই সে তাহার টেবল হইতে মোটা মোটা চারপাঁচপানা বই তুলিয়া লইল। বইগুলি মূল্যবান, এগুলি সে বিভিন্ন পরীক্ষায় স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভারসিটি হইতে পুরস্কার পাওয়াছিল। সুতরাং এগুলিকে তাহার স্বেপাজ্জিত বলা যাইতে পারে। বইগুলি লইয়া সে চলিল কলেজ স্কোয়ারে-পুরাতন বইএর দোকানের দিকে। বইগুলি ছিল তাহার অতিপ্রিয়, বহুদিনের স্মৃণ-দুঃখের সঙ্গী। এগুলিকে বিক্রয় করিতে তাহার কান্না পাইতে লাগিল। অথচ এগুলি বিক্রয় না করিলে হোষ্টেলের ডিউজ মিটান যাইবে না, হোষ্টেল ত্যাগ করিলে অগ্নত্র আশ্রয় লইতে হইবে—সেখানকার প্রাথমিক ব্যয়ও কিছু আছে, এসব হইবে কোথা হইতে। বই বিক্রির টাকাগুলি পকেটে ফেলিয়া সে উত্তর কলিকাতার গলিগুলি চষিয়া বেড়াইতে লাগিল—একটা চলনসই মেসের আশায়। মেস অনেকগুলি পছন্দ হইল বটে, কিন্তু সেখানে ব্যয় অত্যন্ত বেশী, অন্ততঃ অশোকের বর্তমান অবস্থার পক্ষে। আর ত সে জমিদারের ছেলে নহে, এখন সে একজন দরিদ্র ছাত্রমাত্র, পূর্বের মত স্কলারশিপের টাকাও সে আর পায় না।

অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে বৈঠকখানার দিকে একটা মেস সে পাইল—একখানি বড়ঘরে জনদশেক লোক থাকে প্রত্যেকে তিনটাকা করিয়া ভাড়া দেয়, খাওয়ার খরচ সাত আট টাকা। মেসে কোন চাকর নাই, নিজেদিগকেই খাওয়ার পর জায়গা পরিষ্কার, বাসনগাজা ইত্যাদি করিতে হয়। মেসের খরচের দিকটা অশোককে আকৃষ্ট করিল, কিন্তু আহাৰাদির ব্যবস্থা শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

পাণ্ডার পর জায়গা পরিষ্কার, বাসন-মাড়া প্রভৃতি যে করিবার প্রয়োজন হয় ইহাই যেন তাহার কাণে নূতন শোনাইল। অশোক মনে মনে বিচার করিয়া দেখিল, টিউশনি করিয়া তাহার পড়ার খরচ চালাইতে হইবে, তাহাতে ২৫ টাকা অধিক আয় হইতে পারে না, তাহার মধ্যে ১০ টাকা কলেজের মাহিনা দিয়া বাকী বাহা থাকে তাহাতে একপ মেসে থাকা ছাড়া আর উপায় নাই। উত্তর বঙ্গে বহু পশ্চিম বঙ্গে ভূর্তি, গ্রীষ্মাবকাশে শ্রমিক পল্লীতে শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি কাজে ত থাওয়া থাকার সহস্র অসুবিধায় সে অভ্যস্ত হইয়া আছে। তাছাড়া এখানে যারা থাকে তাহারাও ত মানুষ সে কেন এখানে থাকিতে পারিবে না, তাহার জবাব অশোক খুঁজিয়া পাইল না। সে ঠিক করিল, এখানেই সে থাকিবে। সে মেসের ম্যানেজারকে একটা সীটের অগ্রিম ভাড়া দিয়া গেল ও বৈকালে আসিবে বলিয়া গেল।

(২৮)

হোষ্টেলের দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিয়া সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবদের বিন্মিত করিয়া দিয়া বৈকালের দিকে রিক্সা করিয়া মালপত্র লইয়া অশোক মেসে আসিল।

মেসে উঠিয়া যাওয়ার পর দিন হইতে অশোক টিউশনি অথবা অন্য কোন পার্ট-টাইম কাজের চেষ্টায় দিনরাত ঘুরিতে লাগিল। তাহার দামী বইগুলি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছিল, হোষ্টেলের বাকী মিটাইতে এবং মেসে কিছু অগ্রিম দিতে তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। কিছু দিনের মধ্যে উপার্জনের একটা পন্থা খুঁজিয়া না পাইলে তাহাকে পড়াশুনা ছাড়িতেই হইবে, উপরন্তু,

প্রাসাদদান জোটানও কঠিন হইবে, একথা সে বুঝিল। হোস্টেল ছাড়িয়া আসার দুই তিন দিন পরেই কলেজে তাহার নামে বাবাপ নিকট হইতে মনি-অডার আসিয়াছিল, সে উহা ফিরাইয়া দিয়াছিল। দারিদ্র্য লইয়া কবিত্ব অথবা বিলাসিতা করার মত মানসিক প্রবণতা তাহার কোন দিন ছিল না। সে বুঝিয়াছিল দরিদ্র জীবন-যাপন তাহার রুঢ়—প্রয়োজন, বাপের প্রদত্ত দান ভোগের যে স্থানি উহার চেয়ে দারিদ্র্যই বরণীয়।

অশোকের হোস্টেল ত্যাগ লইয়া ছাত্রমহলে দিন কতক হৈ চৈ বাধিয়া গেল,—বড় জমীদারের ছেলে অশোক চৌধুরী, স্কলার অশোক চৌধুরী, লীডার—অশোক চৌধুরী কোন ছুঁথে প্রাসাদোপম হোস্টেল ছাড়িয়া একটা গরীব মেসে উঠিয়া গেল, এ বহুস্ত তাহারা ভেদ করিতে পারিল না। বিলাসিতার সরোবরে যে স্নাতার দিতে পারে কেন তাহার এই ক্রচ্ছ সাধন?

কেহ কেহ বলিল,—আশ্রমের সেই মেয়েটার সঙ্গে অত বনিষ্ঠতা করার জন্য অশোকের বাবা তাহাকে ত্যাজ্য পুত্র করিয়াছেন! কেহ বলিল, অশোকের বাবার জমিদারী নীলামে বিক্রী হইয়া গিয়াছে। বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল ফ্রেড-শাস্ত্র-ধুরন্ধর, সে মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘না হে না, বাপের জমিদারী নীলামে উঠেনি, ওর বাবা ওকে ত্যাজ্য পুত্রও করেনি ওসব হচ্ছে প্রতিক্রিয়া, ঘৃণা ছেলে এই বয়সেই ভেঙে চূড়ান্ত, ডুবে ডুবে অনেক জল খেয়েছেন কিনা তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, যাকে আমরা বলি কিনা—Sublimation, এই ধর না কেন,—a secret desire to elope with your housemaid may develop into a sudden aversion to picked walnuts ইত্যাদি।

মেসে আসার সময় অশোকের মনে হইয়াছিল, সহজেই সে ছুইটা

টিউশনি জোগাড় কত্তিয়া লইতে পারিবে, কিন্তু কার্ষাকালে দেখিল টিউশনি পাওয়া মোটেই সহজ নহে, চাকুরী ইহা হইতে তুল্য নহে। বই বিক্রীর পয়সা ফুরাইয়া আসিয়াছে, জল-খাবার এবং কাপড় ধোয়ানের জগুও যথেষ্ট পয়সা হাতে নাই, মেসেও কিছু দিতে হইবে—এ সব চিন্তা অশোককে পাগল করিয়া তুলিল। তাহার বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য চাহিলে সে উহা যথেষ্ট পাইত বটে, কিন্তু কাহারও কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়া তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কাহারও নিকট প্রার্থী হইলে সে অশোকের এই বিশ্বয়জনক পরিবর্তনের ইতিহাস শুনিতে চাহিবে, আপামর সাধারণকে সে তাহাদের এই পারিবারিক ঘটনা জানাইতে ইচ্ছুক নহে।

খবরের কাগজগুলি কক্ষখালির আশায় সে নিতা দেখিতে লাগিল। একদিন দেখিল,—মাসিক দশটাকা মাহিনায় এক ভদ্রলোকের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছেলের জগু শিক্ষক প্রয়োজন, প্রত্যহ ৩ ঘণ্টা পড়াইতে হইবে, রবিবারও বাদ নাই। শিক্ষককে পাশ করাইবার গ্যারান্টি দিতে হইবে। রবিবারে ৫ টার সময় গৃহস্বামীর সহিত দেখা করিবার নির্দেশও বিজ্ঞাপনে দেওয়া ছিল।

রবিবার বৈকাল পাঁচটার সময় নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়া অশোক দেখিল বাড়ীর সামনের রাস্তায় ইতিপূর্বেই ১৪।১৫ জন প্রার্থী জমা হইয়াছে। সত্তর বছরের বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া কুড়ি বছরের তরুণ যুবক পর্যাস্ত দলের মধ্যে রহিয়াছে, প্রত্যেকের মুখেই দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধজনিত একটা অবসাদ অঙ্কিত। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, দলের মধ্যে দু'একজনের ছাতা ছিল, বাকী সকলের রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভেজা ছাড়া উপায় ছিল না, বিজ্ঞাপনদাতা সকলকে 'ইন্টার-ভিউ' দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবেন। চাকর আসিয়া মাঝে মাঝে গুণিয়া যাইতেছে কতকগুলি লোক আসিল। সংখ্যাটা আরও কিছু বেশী

হইলে সকলকে একে একে ডাকিয়া পরীক্ষা করিবেন, এইরূপ তাহার সংকল্প। এইসব বেকারদের একটা যে বসিতে দেওয়ার স্থান দরকার, ইহা তাহার মনেই আসে নাই। সুতরাং এই সব হতভাগ্য ভদ্রসন্তান দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুষ্টির হাত হইতে আত্ম-রক্ষার জন্ত ব্যথা চেষ্টি করিতে লাগিল। এই বীভৎস দৃশ্যটা অশোকের প্রীতিকর হইল না। যে ভদ্রলোক, দশটাকার মাষ্টার রাগিবেন বলিয়া যাহাদের রুষ্টিতে ভেজা উপভোগ করিতেছেন, তিনি যে লোক ভাল নহেন, সে বিষয়ে তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তারপর এতগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে, পরীক্ষা দিতে হইবে—গুনিয়া অশোকের মনে কেমন যেন ঘৃণা হইল! এই সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আত্ম-মর্যাদা বিসর্জন দিতে তাহার মন সাড়া দিল না, সে আশ্রয় আশ্রয় সেখান হইতে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে অশোক গুনিতে পাইল, প্রার্থীদের মধ্য হইতে কে যেন একজন বলিয়া উঠিল, ‘বাবা, তব একজন Candidate কম্বল, কে জানে হয়ত ওই টিউশনিটা পেত!’

আর একদিন অশোক বিজ্ঞাপন দেখিল, এণ্টালী অঞ্চলে একটা টিউশনি খালি আছে। পায়ে হাঁটিয়া সে বৈঠকখানা হইতে এণ্টালী আসিল। চলিতে চলিতে সে তাহার ঈষ্মিত ঠিকানা যখন খুঁজিয়া পাইল, তখন পথ-চলার জন্ত তাহার পা বেদনায় টাটাইয়া উঠিয়াছে। জায়গাটা রেল লাইনের ধারে। বাড়ীর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ, ডাক দিতেই একটা ছোট মেয়ে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাকে চান?”

অশোক বলিল—“এ বাড়ীতে টিউটারের জন্ত যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল—”

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মেয়েটা বলিল, “ওঃ টিউটর, আপনি বুঝি তাই এসেছেন, কিন্তু সে ত একজনকে নেওয়া হয়ে গেছে!”

হতাশ মনে সে ফিরিল। এই দীর্ঘ পথ আবার তাহাকে পায়ে হাঁটিয়া পাড়ি দিতে হইবে!

আর একদিনের কথা। ল্যাম্পপোটে টিউশনির বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে নিদ্দিষ্ট রাস্তায় গিয়া নিদ্দিষ্ট বাড়ীটা খুঁজিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পাইতেছে না। বাড়ীটার নম্বর ৫১৫ সি। ৫১, ৫২, সব বাড়ীর নম্বরই সে খুঁজিয়া পাইল, কিন্তু ৫১৫ সি, তাহার চোখে পড়িল না—সম্ভবতঃ নম্বরটা মুছিয়া গিয়াছিল। ঐ নম্বরের বাড়ী কোথায় ইহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত ৫১১ নম্বরের বাড়ীর দাওয়ায় উঠিয়া, ঘরে ঢুকিয়া, সে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছে, এমন সময় ভিতর হইতে একজন তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—“হাঁ, হাঁ, ঐখানে থেকেই, আর এগিও না—কি চাই?” লোকটা টাকা গুণিতেছিল। অপমানে, লজ্জায় অশোকের কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল—লোকটা তাহাকে চোর-ডাকাত মনে করিল না কি? তাহার কাপড়-চোপড় খুব ফর্সা নহে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাকে কি আজকাল দারিদ্র্যের জন্ত চোর-ডাকাতের মত দেখাইতেছে! তাহার মনে হইল, কোন কিছু না জিজ্ঞাসা করায় বিপদ আসিতে পারে,—সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—“দেখুন, ৫১৫ সি, নম্বরটা খুঁজে পাচ্ছি না, কোথায় বলতে পারেন?” “এরই ঠিক পেছনে”, বলিয়া, লোকটা আবার নিশ্চিন্ত হইয়া টাকা গোণায় মন দিল। অশোক রাস্তায় পা’ দিয়া শুনিতে পাইল, লোকটা আরেক জন লোককে বলিতেছে, “এমনি শুকনো মুখে, ভাল মানুষ সেজে ঘরে ঢুকছিল বটে, কিন্তু কে জানে ওর কি উদ্দেশ্য,—পকেটে গুলীভরা পিস্তল নিয়ে ও যে রাহাজানি করতে আসেনি, তাই বা কে বলতে পারে! আমি হলেম কলকাতার ঘু-ঘু, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত হে!” অশোকের ইচ্ছা হইল লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে। লোকটা অশিক্ষিত, সম্ভবতঃ গৃহ-স্বামীর কোন কর্মচারী,

টাকা বুঝাইয়া দিতে এখানে আসিয়াছে। এমন মাতৃষের কথায় মন খারাপ করা দুর্বলতা, এই বলিয়া সে উহা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহা হউক, নির্দিষ্ট বাড়ীটা সে এবার খুঁজিয়া পাইল। বাড়ীটাতে পৌছিয়া সে দেখিল, বারান্দায় অনেকগুলি তরুণবয়স্ক ছাত্র বসিয়া আছে—ইহারা সকলেই প্রার্থী। অশোককে দেখিয়া একজন বলিল, “আমুন দাদা,—আপনার কোন্ ইয়ার, বমুন, হয়ত টিউশনিটা আপনার কপালেই নাচ্ছে! ভদ্রলোক কাল বিকালে জন-কুড়িকে ইন্টারভিউ দিয়েছেন। আজ সকালেও জন দশ, আমরা এখনও বাকী!” অবস্থাটা যে অন্তকূল নহে ইহা অশোকের বুদ্ধিতে আর বিলম্ব হইল না। এতগুলি যোগানে প্রার্থী সেখানে তাহার আর ভরসা কি! যদি বা সে পায়, এই ছাত্রদের একজনকে বঞ্চিত করিয়াই হয়ত সে টিউশনিটা পাইবে। সে আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া আসিল। ছেলেগুলি বলাবলি করিতে লাগিল, “ভদ্রলোক কি পাগল নাকি, এলেন আর দেখা না করেই চলে গেলেন!”

আর একজন উত্তর দিল, “হয়ত ঠুঁর খুব Pressing needs নেই, আমাদের মত, দেখচিস্ না বড়লোকের ছেলের মত চেহারা! হয়ত নিজে উপার্জন করব, এটা ঠুঁর একটা সখ।” অশোকের সৌভাগ্য-ক্রমে তাহারা কেহই অশোককে চিনিত না।

এই দুঃসহ দারিদ্র্যের অবস্থায় পরিচিতদের সাহায্যপ্রার্থী হইলে, অশোক উহা যথেষ্টই পাইত। কিন্তু বর্তমানে কাহাকেও কোন অনুরোধ করিতে তাহার ছিল দারুণ অনিচ্ছা। কারণ যাহাকেই সে বলিবে আমাকে একটা টিউশনি কিম্বা কাজ দেখিয়া দাও সে-ই অন্তরঙ্গ হইবার চেষ্টা করিবে এবং জানিতে চাহিবে, তাহার এই বিশ্বয়জনক ভাবাস্তর ও আচরণ কেন? বর্তমান মানসিক অবস্থায় তাহার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপার কাহাকেও জানাইবার স্পৃহা তাহার ছিল না।

অমিতাভ ছিল তাহার একমাত্র বন্ধু। একমাত্র তাহাকেই সে সকল কথা বলিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে সেও কলিকাতা হইতে বহুদূরে। বাকী যাহারা ছিল তাহার। অশোকের সহকর্মী ও অন্তরাগী ভক্ত। ইহাদের সহিত অশোকের বন্ধুত্ব ছিলনা। ইহাদের সহিত ছিল অশোকের একটা গভীর স্বাতন্ত্র্য। অশোকের পরিবর্তন লইয়া ইহারা জল্পনা-কল্পনা করিত বটে, কিন্তু কোন দিন কেহ তাহাকে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করে নাই। ইহাদের অনেকেই বিরুদ্ধদলের যুক্তিতে এই সময়ে অশোকের উপর আস্থা হারাইল।

(২৯)

যাহা হউক, অনেক চেষ্টার পর অশোক সকাল-সন্ধ্যা দুবেলাই দুটি টিউশনি জোগাড় করিতে সমর্থ হইল। ইহার মধ্যে কয়বারই কলেজের ঠিকানায় তাহার বাবার কয়েকখানি পত্র সে পাইয়াছিল। ইহার একটিও কিন্তু সে খুলিয়া পড়ে নাই,—চিঠিগুলি অপঠিত অবস্থায় টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল। এই কয় মাসে বাবার উপর অভিমান তাহার একতিলও কমিল না। পূজার ছুটি সে কলিকাতাতেই কাটাইল। এই কয়মাসে সজ্জের কাজের খুব ক্ষতি হইয়াছিল। পূজার ছুটিয়ায় অশোক সজ্জের কাজকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখিল। হোস্টেল ছাড়ার প্রথম দিকে সে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিত। অভাব তাহাকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই। এই জন্মই কষ্টটা অসহ্য বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এই কয়মাসে সে যেন অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিল। শরীর তাহার ভালই রহিল বটে, তবে তলপেটে মাঝে মাঝে সে একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। যন্ত্রণাটা সাময়িক বলিয়া সে উহা

দীর্ঘ দিন গ্রাস করিল মা। রোগ লইয়া বিব্রত রহিবার দিন আর তাহার নাই। এখন নিজের অল্পের সংস্থান তাহাকেই করিয়া লইতে হইবে, নিজের উপার্জনে পড়িতেও হইবে। পড়াশুনায়ও আর আগের মত অবহেলা করিলে চলিবে না। একটা ফাষ্ট ক্লাশ তাহাকে পাইতেই হইবে, নতুবা প্রফেসারী একটা জুটান যাইবে না। সজ্জের কাজও কিছু করা চাই,—সজ্জটা সে নিজে হাতে গড়িয়াছে, সজ্জের উদ্দেশ্য যাহাতে ব্যর্থ না হয় ইহা তাহাকেই দেখিতে হইবে। তাহার বিরুদ্ধবাদীরা আগামী ইলেকশনে তাহাকে hoot out করিবার ভয় দেখাইতেছে। দেখা যাক, সজ্জের সদস্যেরা কাহাকে চায়—ভজ্জগপ্রিয়দিগকে অথবা একনিষ্ঠ কর্মী অশোক চৌধুরীকে।

দেখিতে দেখিতে শীতকাল আসিয়া পড়িল। অশোক একদিন কলেজে গিয়া টেলিগ্রাম পাইল—কিরণ বাবু হাটফেল করিয়া মারা গিয়াছেন। কোথায় গেল পিতার উপর সঞ্চিত তীব্র অভিমান! বাণ-বিদ্ধ কুরঙ্গের মত ছট্‌ফট করিতে করিতে অশোক মেসে ফিরিয়া, বিছানায় শুইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাবা আর ইহ-জগতে নাই, আর তাহার আত্মীয় বলিতে এ সংসারে কেহ রহিল না! অভিমানের বশবর্তী হইয়া এই কয়মাস সে তাঁহার মনে কি নিদারুণ আঘাতই না দিয়া আসিয়াছে, ইহা ভাবিয়া সে শোকে অস্থির হইয়া পড়িল। হয়ত তাহার ব্যবহারই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ। বাবা তাহার সমস্ত দোষ-ত্রুটি চিরকাল ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন, আর সে কিনা তাঁহার সামান্য একটা দুর্বলতা ক্ষমা করিতে পারিল না! মাসের পর মাস মনিঅর্ডার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে—নিদারুণ ক্ষোভের সঙ্গে পোষ্ট অফিসের নিকট হইতে টাকাগুলি তাঁহাকে ফিরাইয়া লইতে হইয়াছে! প্রত্যেক বারই টাকা পাঠাইবার সময় তাঁহার হয়ত মনে হইয়াছে,—এবার অশোক তাঁহার টাকা লইবে, এবার হয়ত সে তাঁহাকে

ক্ষমা করিতে পারিবে। অশোকের চিঠি তিনি একখানিও পান নাই। কিন্তু তাঁহার পত্র দেওয়ার বিরাম ছিল না। অশোক পত্রগুলি খুলিয়া পড়েও নাই, টেবিলের উপর সেগুলি শুপুকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। অশোক আজ সেগুলি খুলিয়া পড়িতে লাগিল—চিঠির ছত্রে ছত্রে পুত্র-স্নেহের কি গভীর অভিব্যক্তি! সব চিঠিগুলি পড়িয়া সে জানিতে পারিল, বিবাহটা অনেকটা ঘটনাচক্রে তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক চিঠিতে অপরাধীর মত তিনি পুত্রের কাছে মার্জনা চাহিয়াছেন। চিঠিগুলি পড়িয়া অশোক আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, রুতন্ন, পিতৃঘাতী সে, তাহার দুর্ভাবহারে বৃক ভাঙ্গিয়া যাওয়াই তাহার পিতার অকাল মৃত্যুর কারণ। জীবনের এপারে ষাঁহার আর কোন দিন দেখা মিলিবেনা, তাঁহার উদ্দেশ্যে অশোক ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিল, ‘বাবা তোমার অধম সন্তানকে ক্ষমা করিও।’

অশোকের কলিকাতা বিষ বলিয়া বোধ হইতেছিল। বাড়ী যাইবার উদ্দেশ্যে সে হাওড়া স্টেশনে ছুটিয়া আসিল। স্টেশনে আসিয়া তাহার হাঁশ হইল, রাত্রি ৯টার আগে তাহাদের দেশে যাইবার কোন গাড়ী পাওয়া যাইবে না।

(৩০)

তার পরের দিন সকালে সে বাড়ী পৌঁছিল। বাড়ীর দরজায় পা দিতেই তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। আগে যখন সে বাড়ী আসিত, তখন বাবা-মা দুই জনেই তাহাকে দেখিবার জ্ঞান দরজার কাছে ছুটিয়া আসিতেন। বাড়ীখানা ঠিক তেমনিই আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা আজ আর নাই। অশোকের মনে হইল, উত্তর রাম-চরিতের

রামচন্দ্র বহু খেদেই বলিয়াছিলেন, “তে হি নো দিবসাঃ গতঃ”, পিতামাতার স্নেহের আশ্বাদন করিব, আমাদের সেই আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলি চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে! বাড়ীর প্রবেশ পথে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে সোজা উপরে উঠিয়া গেল। দোতলায় সিঁড়ির ধারেই তাহার নিজের শয়ন কক্ষ। বারান্দায় পা দিয়াই সে দেখিল, সেখানে অনাবৃত বক্ষে একটা মেয়ে শিশুকে স্তনপান করাইতেছে। অশোককে দেখিয়া সে মাথায় ঘোম্টা দিল। ইহার পরেই অশোকের পড়ার ঘর। সে ঘরে এক বুড়ী বসিয়া মালা জপ করিতেছে, আর তাহার বইগুলি চারিদিকে ছড়ানো, সম্ভবতঃ বাড়ীর আগন্তুক ছেলেদের সেগুলি ক্রীড়ার বস্তু। ইহার পরের ঘরটা তাহার মায়ের, এঘরে ঘাইয়া সে দেখিল, একটা অল্প বয়সী মেয়ে খান কাপড় পরিয়া বসিয়া আছে। অশোককে দেখিয়া সে মাথার ঘোম্টাটা দীর্ঘ করিয়া দিল, সজ্জা বিধবার বেশ তাহার। অশোক বুঝিল, এই ছুঁতাকা মেয়েটাই তাহার বিমাতা। কিছু না বলিয়া সে এঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। ইহার পাশের ঘরটা তাহার বাবার। মায়ের মৃত্যুর পর ঘরটা বাবা আর ব্যবহার করিতেন না, তালা দেওয়া থাকিত। নীচের বৈঠকখানা ঘরে তিনি শুইতেন, সম্ভবতঃ ঐ ঘরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অশোক দেখিল, পাশের ঘরটাও খোলা—তাহার মধ্যে তাহার বাবার পালঙ্কের উপর যে লোকটা শুইয়া আছে, তাহাকে চিনিতে অশোকের বিলম্ব হইল না। লোকটা রাখহরি মুখুজ্যে, তাহাদের কোন একটা মহালের গোমস্তা, বর্তমানে কিরণবাবুর শস্তর। পদশব্দে চকিত হইয়া রাখহরি দেখিল, অশোক! তাহাকে সে চিনিতে, ছোটবাবু বলিয়া তাহাকে কত খাতিরই না লোকটা আগে করিত! অশোককে দেখিয়া রাখহরি বলিয়া উঠিল, “কিহে অশোক যে, বাপের উপর রাগ পড়ল,

শ্রদ্ধা-শান্তি তুমিই করবে ত, বাপকে ত দন্ধে দন্ধে মারলে!”
লোকটার কথায় অশোক অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিল। পিতৃ-
শোকাতুর পুত্রকে কি উপযুক্ত সম্ভাষণ! এখন জমিদারের শ্বশুর
হইয়াছে, এই জন্তই না সে আজ তাহাকে এরূপ সম্ভাষণ করিবার সাহস
করিতেছে!

কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব ঝাঁঝ মিশাইয়া সে বলিল, “আমাকে অশোক
বলে ডাকার কোন অধিকার বাবা তোমাকে দেন নাই রাখহরি,
তুমি বাবার ভৃত্য ছিলে, বাবার অবর্তমানে আমিই তাঁর উত্তরাধি-
কারী। আমার সঙ্গে তুমি ভৃত্যের মতই ব্যবহার করো। আর
আমার বাবার পারলৌকিক ক্রিয়া-সম্বন্ধে আমিই যা বিবেচনা করব
তাই হবে, এ সম্বন্ধে তোমার কোন প্রশ্ন করার অধিকার নাই।”
অশোক ভুলে নাই, এই লোকটাই নানা ছলে তাহার বাবাকে
বশীভূত করিয়া নিজের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়াই-
য়াছিল। অশোকের কথায় রাখহরি রাগে ফুলিতে লাগিল। মেয়ের
বিবাহের পর হইতে সে-ই হইয়া উঠিয়াছিল, এবাড়ীর এবং জমিদারীর
সর্বময় কর্তা। সে একবার ভাবিল, এত দিনের মধ্যে সে কিরণ
বাবুকে দিয়া একটা উইলও করাইয়া রাখিতে পারে নাই, তাই না
আজ এই ছোড়ার কথা তাহাকে সহ্য করিতে হইল! কিরণবাবু
যে একজন অপদার্থ লোক ছিলেন, এধারণা রাখহরির মনে বহুদিন
হইতেই ছিল। নেহাৎ অপদার্থ না হইলে এমন ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র
করিতে কি আর কেহ দ্বিধা করে! রাখহরির মনে হইল, ভগবান
স্বয়ং তাহার শত্রু, কোথায় জমিদারের শ্বশুর হইয়া রাজার হালে
থাকিবে তা নয়, জামাই মেয়ের জন্ত কোন ব্যবস্থা না করিয়াই
গেল মরিয়া! মেয়েটাকে সারাজীবন ঐ বদরাগী, কলেজে-পড়া ছোড়ার
দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে, ষ্টেটের আর কি কেহ

তাহাকে মানিবে! ছোড়া এতদিন আসে নাই—বেশ ছিল। আসিতে-না-আসিতেই চাকর-চাকরাণী কে কোথায় ছিল সব খোকাবাবুর চারিপাশে জড় হইয়াছে :—কেহ সামুনা দিতেছে, কেহ অশ্রুপাত করিতেছে—দরদ দেখ না উহাদের! রাখহরি মুখ্যো এই সব ভাবিতে লাগিল।

উপরের ঘরগুলি বিমাতার আত্মীয়-স্বজন কতক অধিকৃত। অশোক অগত্যা বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে আশ্রয় লইল। তাহার পিতার শেষ দিনগুলি এই ঘরের মধ্যে কাটিয়াছে—ঘরখানি তাহার কাছে তীর্থের মত পবিত্র! শ্রাদ্ধাদির ব্যয়ের জ্ঞা জমিদারীর হিসাব-পত্র তাহাকে করদিন ঘাটিতে হইল। পাতা-পত্রের নারফং এবং বিদ্যাসী পুরাতন নায়েব মধুরায়ের নিকট জমিদারীর বর্তমান অবস্থার যে পরিচয় পাইল তাহা অশোকের দারণার অতীত। তাহাদের অবস্থা যে দিন-দিন খারাপ হইতেছে একথা কিছুদিন পূর্বে সে বাবার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ ও কথাবার্তা হইতে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহা হইলেও অবস্থা যে এতদূর শোচনীয় ইহা সে জানিত না। কিরণবাবু যে ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্ত মহালগুলি বিক্রয় করিলেও শোধ হইবে কিনা সন্দেহ। অশোক শুনিল, এক কয়মাসে রাখহরি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জ্ঞা, কন্টার অলঙ্কার প্রভৃতি নির্মাণের জ্ঞা কিরণবাবুকে যে ঋণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছে, ইহার অর্দ্ধেক ঋণও তাহার পূর্বে ছিল না। মধুরায়ের নিকট শুনিল, তাহার বাবা মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রায়ই বলিতেন, “অশোকের জ্ঞাে কিছুই রেখে যেতে পারব না মধু, শুধু তাকে ঋণে জড়িয়ে যাচ্ছি!” রাখহরির উদ্দেশ্য যে তাঁহাকে বেশ করিয়া শোষণ এবং এই উদ্দেশ্যেই যে সে তাঁহার সহিত নিজের কন্টার বিবাহ দিয়াছে, ইহা তিনি আজকাল বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মধুর নিকট

এই সব তথ্য অবগত হইয়া অশোক চিন্তাক্রিষ্ট হইল। সে ঠিক করিল, তহবিলে যে অর্থ মজুত আছে তাহা দিয়াই পিতার শ্রাদ্ধাদি নিৰ্ব্বাহ করিবে। ইতিমধ্যে সে সদরের উকিল স্মধাংশু বাবুর এক পত্র পাইল। স্মধাংশুবাবু শুধু তাহাদের ষ্টেটের উকিলই নহেন, তাহার পিতার একজন বিশিষ্ট চিঠিতৈষী বন্ধুও, ইহা সে জানিত। স্মধাংশুবাবু তাহার পিতার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং তাহাকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া লিখিয়াছেন,—তাহার পিতার বিপুল ঋণের কথা সে নিশ্চয়ই অবগত আছে। পাওনাদারেরা কেহ কেহ নালিশ করিয়াছে, কেহবা শীঘ্রই করিবে। এ অবস্থায় কি করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্ত সে যেন তাহার সহিত একবার দেখা করে। অশোক ইতিমধ্যেই তাহার কর্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিল। সাধারণ জ্ঞান হইতে সে বুঝিল, পিতার ঋণ শোধ করা ধর্ম্মতঃ ও আইনতঃ তাহারই কর্তব্য। পিতা যখন কোনরূপ উইল করিয়া যান নাই তখন তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী সে-ই। তাহার বিমাতা আজীবন ভরণ-পোষণ দাবী করিতে পারেন মাত্র। অবশ্য শুধু তাঁহার আজীবন ভরণ-পোষণ কেন, সগোষ্ঠীর আজীবন গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান রাখহরি এই ছয়মাসে করিয়া লইয়াছে। তাহাদের জমিদারীর আত্মমানিক মূল্য এবং তাহার পিতার সমস্ত ঋণের পরিমাণ করিয়া সে দেখিল, জমিদারীটা বিক্রী করিয়া দিলে তাহার পিতার সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া যায়। ইহাতে সে একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইবে, তাহাতে অবশ্য তাহার কোন ক্ষতি নাই। পিতাকে জীবনে সে শান্তি দেয় নাই, মৃত্যুর পরে তাঁহাকে অশ্রুণী করিয়া সে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি বিধান করিবে। তাহার সঙ্কল্পের কথা কাহাকেও সে জানাইল না। কারণ এখন প্রকাশ হইয়া গেলে রাখহরি নানারূপ গুণ্ডগোল পাকাইবার চেষ্টা করিবে,—এদিকে তাহার

নিজের হিতৈষী মধুর মত পুরাতন কর্মচারীরা তাহাকে বাধা দিবে, নিজেদের জ্ঞাতসারে তাহাকে কান্দাল হইতে উহারা দিবে না। অশোকের মনে এই বলিয়া কষ্ট হইতে লাগিল যে, আহা, যাহারা বংশান্ত্রকমে আমাদের বাড়ীতে মানুষ্য, উহাদের কি অবস্থা হইবে! পিতৃ-পুরুষের অর্জিত সম্পত্তি তাহারই সময়ে তাহার হাত হইতে চলিয়া যাইবে, ইহাতেও তাহার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। দুভাগা সে,—তাহার যে আর অল্প উপায় নাই!

যথাসম্ভব বিনা আড়ম্বরে তাহার পিতার শ্রাদ্ধাদি কায়া সে সম্পন্ন করিল। তারপর একদিন সে গেল সদরে স্বধাংশুবাবুর সন্নিহিত দেখা করিতে। স্বধাংশুবাবুকে সে তাহার সঙ্কল্পের কথা বলিল। স্বধাংশুবাবু অশোককে চিনিতেন অশোককে যখন চিঠি লিখেন তখনই তাঁহার মনে হইয়াছিল, অশোক কি করিতে চাহিবে। অশোক যে নিজেকে একেবারে বিত্ত করিতে চায় ইহাতে তাঁহার মনেও খুব দুঃখ হইল। পাওনাদার ঠকাইবার দুই-চারিটা আইনের ফাঁক যে আছে উকীল হিসাবে তিনি অশোককে তাহা জানাইলেন। অশোক সোজা মানুষ্য, যে সহজ বুদ্ধি তাহাকে কর্তব্যের নির্দেশ দিয়াছে তাহাকে সে অতিক্রম করিতে চায় না। স্বধাংশু বাবু অশোকের দৃঢ়তায় প্রীত হইলেন ও তাহার নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি কিরণ বাবুর পাওনাদারদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিরণবাবুর প্রধান পাওনাদার রামশরণ জোখীরাম, ছোটখাট পাওনাদার আরও অনেক। রামশরণকে মুখপাত্র করিয়া তাহার এক রবিবারে স্বধাংশুবাবুর বৈঠকখানায় জমায়েৎ হইল। স্বধাংশুবাবু তাহাদিগকে কিরণ বাবুর তাক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ও মূল্য জানাইলেন। তিনি বলিলেন, মামলা মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিলে তাহাদের কোন লাভই হইবে না, খরচ করাই হইবে সার।

অশোকের প্রস্তাবানুযায়ী তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, বাষিক এক হাজার টাকা আয়ের একটা মহাল আর বনভুলসীর বসত বাটা বাদে বাকী জমিদারীটা সকলে মিলিয়া প্রাপ্য অমুখ্যায়ী ভাগ করিয়া লইতে। জোখীরামের জমীদার হইতে বড় সাধ, সে প্রস্তাবটা লুফিয়া লইল। সে বলিল, জমিদারীটা সে একাই লইবে, এবং কিরণবাবুর অগ্র পাণ্ডনাদারদের প্রাপ্য সে-ই মিটাইয়া দিবে। মানুষ্য মরিয়া গেলে তাহার উত্তরাধিকারীর নিকট প্রাপ্য আদায় করা সহজ নহে! পাণ্ডনাদারেরা এইজন্ত কিরণ বাবুর ছেলের আচরণে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল, কিরণবাবু বড় ভাল লোক ছিলেন, গুঁর ছেলে ভাল হইবে না কেন।

পিতার সমস্ত ঋণ পরিষ্কার করিয়া সে বাষিক একহাজার টাকা আয়ের মহালটা তাহার বিমাতার নামে লেখাপড়া করিয়া যখন রেজেষ্ট্রী করিতে গেল, তখন সূধাংশু বাবু আরও আশ্চর্য্য হইলেন, বুঝিলেন, ইহাকে নিবৃত্ত করা সহজ নহে, তিনি আর তাহাকে কিছু বলিলেন না।

সদরেয় সমস্ত কাজ শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় যখন সে বাড়ী পৌঁছিল তখন বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। সেরেস্তার পুরাতন কর্মচারীরা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া পায়ের কাছে পড়িয়া বলিল, দাদাবাবু, কেন আমাদের তাড়ালেন, আমাদের কার হাতে দিয়ে গেলেন! চাদরের প্রান্ত দিয়া অশোক অশ্রু মুছিল।

বাড়ী ঢুকিয়া সে গুনিতে পাইল, রাখহরি রটাইতেছে অশোক একজন পাকা শয়তান, তাহার মেয়েকে ফাঁকি দিয়া সে সমস্ত সম্পত্তিটা কৌশলে বেনামী করিয়া আসিল—নিজের ভোগের জন্ত।

অশোক সোজাহুজি তাহার বিমাতার ঘরে ঢুকিল। মেয়েটী বসিয়াছিল, অশোককে দেখিয়া ঘোমটা খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অশোক তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “শুভ্রন, আমার বাবাকে যদি আপনি শ্রদ্ধা-ভক্তি করে থাকেন তবে শুনে সুখী হবেন, তাঁর সম্পত্তি বিক্রী করে তাঁর সমস্ত ঋণ আমি আজ শোধ করে এলাম। আপনার বাবা যা বলেন বিশ্বাস করবেন না, আমি নিজের জন্তে কিছুই রাখিনি। এই বাড়ীখানা আর বাষিক একহাজার টাকা আয়ের সম্পত্তিটা আপনার জন্তে রইলো, এটা আমি বিক্রী করিনি। আশা করি, আপনার একলার জীবন বেশ চলে যাবে। আমি হয়ত চিরদিনের মত এবাড়ী ছেড়ে চল্লুম। আপনি বয়সে আমার চেয়ে ছোট, কিন্তু সম্পর্কে বড়, আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছি।” মেয়েটি যেন কি বলিতে যাইতেছিল, অশোক তাহাকে তাহার সুযোগ না দিয়া শুধু কাগজখানা তাহার হাতে দিয়া চলিয়া আসিল।

সেইদিনই রাত্রিঃ অন্ধকারে অশোক গ্রাম ত্যাগ করিল।

(৩১)

কলিকাতায় আসিয়া অশোকের মনে হইতে লাগিল তাহার সমস্ত জীবন এখন অর্থশূন্য। বাবা নাই, মা নাই, কাকাবাবু নাই—মাধননা নাই,—নাই—নাই—কেহ নাই। যাহাদের লইয়া সে জীবন আরম্ভ করিয়াছিল তাহারা তাহার জীবন প্রভাতেই যেন কোথায় চলিয়া গেল। যন্ত্রচালিতের মত সে কলেজে যাওয়া আসা করিল। দুই বেলা টিউশনিও করিতে লাগিল, দারুণ অনিচ্ছার সহিত। দেহ ও মন চায় এখন পরিপূর্ণ বিশ্রাম, কিন্তু অল্পচিন্তা বাহার আছে জীবনের গভীরতম দুর্ঘটনাও তাহাকে একমূহূর্ত্ত সময় দিবে না— তাহার ক্ষতির হিসাব করিবার। আর সকলের জীবন-শ্রোতের

সঙ্গে তাহার জীবনের যে কোন সামঞ্জস্য আছে ইহা সে আজকাল ভাবিতে পারে না।

ঠিক এই সময়ে আসিল সজ্জের সেক্রেটারী নির্বাচন। তিন বছর আগেকার সেই পুরাতন উৎসাহ আর অশোকের নাই, তাহার তখনকার আর এখনকার জীবনে যথেষ্ট প্রভেদ। সজ্জের নির্বাচন-প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা তাহার ছিল না। যাহারা এবার নির্বাচন প্রার্থী তাহারা সব অশোকের বিরোধী দল। ইহাদের সঙ্গেই কিছুদিন আগে সজ্জের টাকা খরচ লইয়া অশোকের নৃতভেদ হয়। নির্বাচনে জয়ী হইয়া দেখাইয়া দিবে সে, যে তাহার উপরেই সজ্জের সদস্যদের বিশ্বাস। সে গ্রায় ও সাধারণের অন্তিমোদিত পথেই কাজ করিয়াছে—এই আশায় অশোক প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিল। এসব তাহার পিতার মৃত্যুর আগের কথা। পিতার মৃত্যুর পর কলিকাতায় আসিয়া সে নির্বাচনের জন্ত কোন উৎসাহ দেখাইল না, তাহার অন্তরাগী দুই একজন সভ্য সে যাহাতে নির্বাচিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকে অশোকের বিরুদ্ধে সজ্জের সদস্যদের মধ্যে জোর প্রচার-কাণ্ড চলিতে লাগিল। অশোকের তেজস্বী ও সাধু স্বভাবের জন্ত সজ্জের বাহিরেও তাহার ব্যক্তিগত শত্রুর অভাব ছিল না। কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক থাকার সময় হয়ত ইহাদের কাহারও রচনা সে মনোনিয়ন করে নাই, পরীক্ষার সময় কাহাকেও বা অসাধু উপায় অবলম্বন করিতে সহায়তা করে নাই, কাহাকেও বা ছাত্রীদের সহিত অশিষ্ট আচরণের জন্ত ধমকাইয়া দিয়াছিল! অনেকের প্রকৃতি এইরূপ যে, যাহারা প্রকৃত সং তাহাদিগকে তাহারা দেখিতে পারে না। অশোকের দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহার এইরূপ সহপাঠী-বন্ধুর অভাব ছিল না। ইহারা সকলে মিলিয়া দেখিল,—অশোককে জন্ম ও অপমানিত করিবার স্বযোগ

উপস্থিত,—সজ্জের নির্বাচনে তাহাকে হারাইয়া দিতেই হইবে। ইহার। সকলে সজ্জের সদস্তও ছিলনা, তবুও ইহার। গায়ে পড়িয়া সজ্জের সদস্তদের মধ্যে প্রচার কায্য চালাইতে লাগিল।

ক্রমে নির্বাচনের দিন আসিয়া পড়িল। নির্বাচনের স্থান ছিল সজ্জের আফিস। অশোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস সজ্জের সদস্তরা প্রকৃত সেবার মধ্যাদা বুঝিলে নিশ্চয়ই অশোককে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করিবে। নিজে উপস্থিত থাকিলে পাছে কেহ প্রভাবান্বিত হয়, এজন্য নিজে সে সেদিন নির্বাচন স্থানে গেল না। কলেজ হইতে আসিয়া মেসেই সে থাকিল। তাহার অন্তরাগী বন্ধুদেরও বলিয়া দিল তাহার পক্ষ লইয়া কোনরূপ ক্যানভাসিং যেন তাহার। না করে। তাহার বিশ্বাস সদস্তরা আসল ও মেকির পার্থক্য ভাল করিয়াই বুঝিবে।

এদিকে নির্বাচন ক্ষেত্রে আরম্ভ হইল তুমুল ব্যাপার। দুই চারিজন করিয়া সভ্য আসিতে না আসিতেই প্রেসের নাম-দাম হীন নানারূপ ইস্তাহার কাহার। যেন প্রচার করিতে লাগিল। এইসব কাগজ অশোকের প্রতি জঘন্য আক্রমণে পূর্ণ। অশোক সজ্জের টাকা চুরি করিয়াছে, সে চরিত্র-হীন, বেশী-পল্লীতে তাহাকে বহুবার দেখা গিয়াছে। অবলারক্ষা আশ্রমের বনলতানাম্মী মেয়েটির সহিত তাহার সম্পর্ক কি ছিল? তাহাকে সিদ্ধুদেশে চালান করা হইল কেন? ইত্যাদি নানা জঘন্য আক্রমণমূলক কথায় কাগজগুলি পূর্ণ। অশোকের বিরুদ্ধে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহার।ও কাগজগুলি দেখিয়া দুঃখিত ও লজ্জিত হইল। এবং এইসব কাগজবিলি বন্ধ করার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের অজ্ঞাতসারে সজ্জের বাহিরের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লোকেই যে এই সব কাগজ ছাপাইয়া বিলি করিতেছিল তাহার। তাহ। বুঝিতে পারিল। ভিড়ের মধ্যে যে কোথা হইতে এই সব কাগজ বিলি হইতেছিল তাহার।ও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

অশোকের বন্ধুরা গোলমালের মধ্যে বুথাই অশোকের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কীৰ্ত্তি অপেক্ষা কলঙ্কেই মানুষ বিশ্বাস করে বেশী! ভোট গণনার সময় দেখা গেল, প্রচার-পত্রগুলিতে কাজ হইয়াছে—অত্যন্ত অধিক ভোটে অশোক পরাজিত হইয়াছে। অশোকের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী স্বধীন সেন ভোট গণনার পর বলিল, “না, না, এ election ঠিক হল না, আমরা চাই fairfight,—অশোক বাবুর বিরুদ্ধে অত্যাঘ প্রচার কার্যের জন্যেই আমরা জিতেছি।” স্বধীনের দল ঠিক করিল অশোক রাজী হইলে তাহারা আবার re-election করিবে।

নির্বাচন কেন্দ্রে বিলি করা কাগজগুলি এবং তাহার কলিত কলঙ্কগুলি হাতে-হাতে এবং মুখে-মুখে অনেকদূর ছড়াইয়া পড়িল। অশোককে যাহারা ভাল করিয়া চিনিত তাহারা সমস্তই অমূলক বলিয়া মনে করিল বটে, কিন্তু স্বল্প-পরিচিত এবং অপরিচিত যাহারা তাহারা এগুলি নির্বিচারে মানিয়া লইয়া, মনে মনে বলিল, “ভেতরে ভেতরে এত ব্যাপার, বাইরে ত মনে হয় বুঝি বা বিবেকানন্দই আবার এসে জন্মালেন!”

যথাসময়ে কয়েকখানা প্রচারপত্র এবং পরাজয়ের সংবাদ দুই-ই অশোকের নিকট পৌছিল। ক্ষোভে দুঃখে-অভিमानে এবং অপमानে অশোকের মনে হইল, “মা ধরণী দ্বিধা হও!”—অন্য সময় হইলে বাড়ী হইতে বাহির হইতেও সে সঙ্কোচ বোধ করিত, কিন্তু অন্য সময়ের অশোকে এবং এখনকার অশোকে অনেক তফাৎ। সজ্জের নেতৃত্ব না থাকিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু সন্ধ্যার টিউশনিটা গেলে তাহাকে অনাহারে কাটাইতে হইবে। বহুকষ্টে এটা সে জুটাইয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে শাটটা গায়ে দিয়া সে বাহির হইল। টিউশনিটা আবার শ্যামবাজার অঞ্চলে, সমস্ত রাস্তাটা পায়ে হাঁটিয়া তাহাকে যাইতে হইবে।

আজকাল ট্রামে বাসে উঠা সে বন্ধ করিয়াছে—তাহার এত পরস্রা কোথায় !

অশোকের ছাত্র একটা নহে, একটা ছাত্রীও আছে। ছাত্রীটা ক্লাস নাইনের, ছাত্রটা ক্লাস টেনের। বাড়ীর কর্তা জন্মেজয় বিশ্বাস সওদাগরী আপিসের বড়বাবু ছিলেন। বর্তমানে অবসর লইয়াছেন। পার্কে বসিয়া সমবয়সীদের সঙ্গে বিশ্বরাজনীতির চর্চা করিয়া কাটান। সেদিন প্রাতঃকালে হিটলার, মুসোলিনী, জেনারেল ফ্রান্সো ও তথা ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জাপানের সমর-নীতি লইয়া আলোচনাটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। বেলা হইয়া যাওয়ায় আলোচনাটা শেষ হয় নাই। আলোচনাটা পুনরাস্তুর আগ্রহে বিশ্বাস মহাশয় সেদিন বৈকালে একটু আগেই পার্কে আসিলেন। তিনি একা আসিলে কি হয়, সঙ্গীদের তখনও দেখা নাই! বিশ্বাস মহাশয়, অগত্যা পার্কে দু'তিনটা 'চক্র' মারিলেন—তবুও কাহারও দেখা নাই। একদল কলেজের ছেলে একটা বেঞ্চে বসিয়া এতক্ষণ হল্পা করিতেছিল। তাহার। উঠিয়া গেলে বিশ্বাস মহাশয় সেখানে বসিয়া পড়িলেন—এতক্ষণ হাঁটিয়া পা ছুটা ধরিয়া গিয়াছে। বেঞ্চার উপরে হৃদে রঙের কি একটা কাগজ পড়িয়া আছে। তিনি মনে করিলেন নতুন ডাইং-ক্লিনিং, কিম্বা পাইস-হোটেল খোলার বিজ্ঞাপন, হয়ত ছেলেরা ফেলিয়া গিয়াছে। বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে থাকিতে একসময় বিশ্বাস মহাশয়ের চোখে পড়িল, উহাতে লেখা আছে—তাকে বিশ্বাস করিবেন না। বিশ্বাস মহাশয়ের কোতৃহল হইল। তিনি কাগজখানা পড়িবার জন্ত তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, উহাতে লেখা রহিয়াছে—অশোক চৌধুরী সজ্জের বজ্র টাকা চুরি করিয়াছে। অশোক চৌধুরী—অশোক চৌধুরী, নামটা যে তাঁহার চেনা; থাম, থাম, তাঁহার ছেলে মেয়ের মাষ্টারের নামই ত অশোক চৌধুরী! সজ্জ—ই্যা, ই্যা, মাষ্টারটির যে সজ্জ-টজ্জ আছে—এ ত তিনি

ছেলে মেয়েদের মুখেই শুনিয়াছেন। “আশ্রমের মেয়েটার সহিত তাহার সম্পর্ক কি ছিল?” সম্পর্ক আর থাকিবে ক’টা—একটাই! জন্মেজয় বাবু মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন,—কি ভয়ঙ্কর কথা! এই দুশ্চরিত্র লোকটীর হাতেই তিনি ছেলেমেয়ের ভার দিয়াছেন! মাষ্টার রাখিতে ছিল তাঁহার বরাবর অনিচ্ছা, গৃহিণীর জেদে পড়িয়াই তাঁহাকে মাষ্টার রাখিতে হইয়াছে। ছেলের অপেক্ষা মেয়েরই মাষ্টারের প্রয়োজন বেশী, সামনের বারে সে ম্যাট্রিক দিবে। পুরুষ মাষ্টার রাখিলে ছেলে-মেয়ে দুজনকেই একথরচে পড়ান যাইবে, সেই জন্যই পুরুষ মাষ্টার রাখা। গৃহিণী কি যে ধরিয়া বসিয়াছেন—মেয়ে আমার ম্যাট্রিক পাশ করুক! নিজেত বয়স কালে চিঠিতে ‘প্রাণনাথ’ কথাটাও শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারিতেন না। তাঁহার সখ দেখনা—মেয়ে আমার ম্যাট্রিক পাশ করুক! ম্যাট্রিক পাশ, আরে সে কি মেয়ের বাবাই করিয়াছে! নাঃ গৃহিণীর পরামর্শে সর্বনাশ হইবে দেখিতেছি! ঋষিরা কি সাধে বলিয়াছেন, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! অমন চরিত্রহীন লোককে ত আর বাড়ীতে আসিতে দেওয়া ঠিক নয়। তাঁহার বাড়ীতেই আবার কখন কি কেলেঙ্করী বাধাইয়া দেয় ঠিক নাই! জন্মেজয়বাবুর আর বেড়ান হইল না—জগতের বৃহত্তর সমস্যাগুলি কাল প্রাতঃকালের সময় পর্যন্ত জিয়ান রহিল। বাড়ী ফিরিয়াই জন্মেজয়বাবু একসঙ্গে গিম্নি, রামপূজন পাচক, শিউসেবক ভৃত্য এবং নস্তা ও খেস্তির (পুত্র ও কন্যা) নাম ধরিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। ভৃত্য ও পাচক স্বদেশীয়দের সঙ্গে অবসর যাপন করিতে গিয়াছে, নস্তা ফুটবলের মাঠে, খেস্তি গালের উপর নির্দয় ভাবে হিমাদী রগড়াইতেছে—সুতরাং অগত্যা গৃহিণীকে আসিয়া বলিতে হইল, “কিগো অত চীৎকার কেন? না বেড়িয়ে এসময়ে ফিরে এলে কেন?” কর্তা গৃহিণীর রসিকতায় বিরক্ত হইলেন,—গভীর মুখে বলিলেন, “নস্তা কই, খেস্তি কই?” নস্তার ঠিকানা

পাইলেন না। খেস্তি-জননী খেস্তির সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগেই খেস্তি ওরফে ক্ষণপ্রভা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল,—তাহার প্রসাধন পূর্ব শেষ হইয়াছে। জন্মেজয় বাবু তাহার দিকে মুখ না ফিরাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের মাষ্টারের নাম অশোক চৌধুরী?” খেস্তি বলিল, “হ্যাঁ, তিনি এম-এ পড়েন।” জন্মেজয়বাবু বলিলেন, “তার সম্বন্ধ বলে কিছু আছে?” খেস্তি বলিল, “হ্যাঁ, বাবা, উনি একজন মস্তবড় ছাত্র-নেতা। কেন, আপনি খবরের কাগজে ওঁর সম্বন্ধে কত প্রশংসা বেরোয় তা পড়েন নি?” জন্মেজয় বাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, “হুঁ, বুঝেছি। কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছি, ও মাষ্টারের সামনে আর বেরুতে পাবেনা, বুড়ো দেখে নতুন মাষ্টার রাখব, যাও এখন ঘরে যাও।”

খেস্তি জানিত বাবা রাগিলে, তাহার কথার উপর কথা বলিলে আর রক্ষা নাই। খেস্তি-জননী আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না। সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। দুজনেই ভাবিল, কর্ত্তা মাষ্টারের সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছেন। মাষ্টার মহাশয়ের সম্বন্ধে খেস্তি এবং নম্ব উভয়েরই আঁকার সীমা ছিলনা। তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে শুনিয়া খেস্তি অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু বাপকে কিছু বলিতে সাহস করিল না—যে মানুষ, চুলের মুঠি ধরিয়া দুই চার চড় যদি লাগাইয়া দেন!

কল্যাণ ও গৃহিণী চলিয়া গেলে জন্মেজয় বাবু নিজের ক্যাশ বাস্ক হইতে পনেরটা টাকা বাহির করিলেন। আজ মাসের ২৮শে তারিখ, আর তিন দিন হইলে মাসপূর্ণ হইয়া মাষ্টারের ১৫ টাকা পূর্ণ হইত। তা হউক, যখন তাড়াহুয়াই দেওয়া হইতেছে, তখন আর মাহিনা-কাটাটা ঠিক নহে। মাষ্টারটা নাকি পড়ায় ভাল, ফাঁকি দেয় না। কিন্তু চরিত্রহীন যে! ছাপার অঙ্করকে ত আর অবিশ্বাস করা

যায়না, আর একজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা ত আর কেহ ছাপার অক্ষরে রটাইতে পারে না! জন্মেজয় সুনীতি ও সদাচারের আজন্ম পক্ষপাতী। একে এখনকার মতাদের চরিত্রবল অল্প, তাহাতে তাঁহাদের মত প্রাচীনরা যদি চরিত্রহীনতাকে প্রশংসা দেন, তবে যে সমাজ অধঃপাতে যাইবে! তাঁহারা যে কয়দিন আছেন, অন্ততঃ, সে কয়টা দিন সমাজের অধঃপতন — আর তাঁহারা হইতে দিতে পারেন না!

অত্যন্ত উদাস ও পীড়িত মন লইয়া অশোক সন্ধ্যা বেলায় পড়াইতে আসিল। অন্যদিন অপেক্ষা আজ একটু আগেই সে আসিয়া বাড়ীতে পা দিতেই, বাড়ীর চাকর আসিয়া বলিল, “বাবু, আপনি আর কাল থেকে আসবেন না। এই দিন আপনার মাইনে।” চাকরটা হৃদে কাগজে মোড়া পনেরটি টাকা তাহার হাতে দিল। মোড়কটা তাহার বিরুদ্ধে প্রচারিত লিফ্-লেট গুলির একটি। ব্যাপার যে কি অশোক তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। গৃহস্থামী কোথা হইতে একটি কাগজ পাইয়াছেন, তাহারই উপর বিশ্বাস করিয়া তাহার এই বিতাড়ন। অপমানে, ক্রোধে অশোক থব্ থব্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ইহাদের সঙ্গে বাক্যব্যয় নিরর্থক বলিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাস্তায় চলিতে চলিতে সে ভাবিল, কাগজগুলির প্রচার মন্দ হয় নাই! ইতিমধ্যেই নানা স্থানে তাহার চরিত্র লইয়া নিষ্করণ সমালোচনা চলিতেছে। পরিচিত অপরিচিত সকলেই রুচি সহকারে তাহার অপবাদগুলি বিশ্বাস করিবে এবং উহা লইয়া আলোচনাও করিবে। ইহার পর লোক-সমাজে মুখ দেখানও তাহার পক্ষে হইয়া উঠিবে লজ্জাজনক। হায় ভগবান, সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া, দেশের সেবা করিয়া সে হইল চোর! নিরপরাধ, নিষ্কলুষ একটা মেয়েকে জীবনের পথে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া সে হইল চরিত্রহীন! শৈশব হইতে কত সাধনায় সে নিজের যে অকলঙ্ক

শুভ্র জীবন গড়িয়া তুলিল, আজ এক কথায় লোকের কাছে সেটা হইয়া গেল ভণ্ডামির বহিঃপ্রকাশ ! ধন্য দেশ, ধন্য সমাজ ! অশোক চৌধুরী তোমাদের জন্য আত্ম-ভাবিবে না, তাহাকে তোমরা উচিত পুরস্কারই দিয়াছ ! পথ চলিতে চলিতে তাহার চোখে পড়িল, গলির মোড়ে একটা মদের দোকান। অশোকের শরীর ছিল অসুস্থ, মনে বহিতেছিল, বাড়, কি মনে করিয়া সে দোকানে ঢুকিয়া পড়িল। দোকান হইতে যখন বাহির হইল তখন সে স্বতন্ত্র মানুষ। গলির মোড় হইতে বড় রাস্তার দিকে সে পা বাড়াইতেছিল, ফিরিয়া আবার সে গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। বহুদিন আগে এই গলিরই একটা বাড়ী হইতে সে বনলতাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল, মানসিক উত্তেজনার চরম মুহূর্তেও একথা তাহার মনে পড়িল। গলিতে প্রবেশ করিবার আগে একবার সে থমকিয়া দাঁড়াইল, আবার সে দ্বৈধী ভাব কাটাইয়া উঠিল, না--না--সে লজ্জা করিবে কাহাকে। সে ভয় করিবে কাহাকে ! সে যে চোর—সে যে চরিত্রহীন—সে যে ভণ্ড, ভদ্রসমাজে যে তাহার স্থান নাই, নহিলে কি ভদ্রলোকের বাড়ী হইতে তাহাকে চাকর দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয় ! সমাজ ত তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে—সে আর সমাজকে ভয় করিবে কেন ? দুর্বলতাকে যে কোন দিন প্রশ্রয় দেয় নাই,—অন্যায়-অবিচার তাহাকে আজ তাহারই দিকে ঠেলিয়া দিল।

(৩২)

এই ঘটনার পর মাস দুই কাটিয়া গেল। অমিতাভ অশোকের নিকট হইতে নিয়মিত পত্র পাইত। বাবার মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত সকল সংবাদই

অমিতাভ পাইয়াছিল। তাহার পর হইতে অশোকের আর কোন সংবাদ তাহারা পায় নাই। তাহার জীবনে আসিয়াছে ভয়ানক পরিবর্তন, অত্যন্ত মানসিক অশান্তির মধ্যে সে বাস করিতেছে, তাহার জন্য অমিতাভরা উদ্বিগ্ন। অথচ কোন সংবাদও মিলিতেছে না, ইহাতে তাহারা চঞ্চল হইয়া পড়িল। এমন কি হইল, যাহার জন্য অশোকের কুশল সংবাদ লিখিবারও সময় নাই। সে দেশান্তরী হইল নাকি! সামনে, ইষ্টারের ছুটি, অমিতাভ অশোকের সন্ধানে কলিকাতায় আসিল। দিদি বারবার করিয়া বলিয়া দিলেন, ফিরিবার সময় অশোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে। অশোকের প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ।

অশোকের মেসের ঠিকানা অমিতাভ জানিত। সেখানে গিয়া দেখিল, মেসের বাবুরা সব কাজে বাহির হইয়াছেন। অগত্যা সে অশোকের সাবেক হোষ্টেলে আসিল। সেখানে একটা ছেলের মুখে অশোকের গত কয় মাসের কাহিনী শুনিয়া অমিতাভ বিস্মিত ও দুঃখিত হইল। হতভাগা করিয়াছে কি, এয়ে আত্মহত্যারই নামান্তর! অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও, সে মনে মনে অশোককে ক্ষমা করিল। স্নেহ-মমতা-সহৃদয়তা মানুষের যে সময়ে প্রয়োজন ঠিক সেই সময়ে সে পাইয়াছে রুঢ় আঘাত ও অপমান। অশোক যাহা করিয়াছে তাহা মানসিক স্বস্থতার সময়ে করে নাই,—দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অস্থিরতার বশবর্তী হইয়াই করিয়াছে। অশোকের প্রতি যেটুকু রাগ তাহার হইয়াছিল তাহা কোথায় যেন উবিয়া গেল—যখন সে শুনিল, সে এখন মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে—কিছুদিন পূর্বে তাহার এপেন্ডিসাইটিস্ অপারেশন হইয়াছে। এই কয় মাস শরীরের প্রতি সে কোন যত্ন লয় নাই, ক্রমবর্দ্ধমান যন্ত্রণারও কোন প্রতিকার করে নাই, যন্ত্রণায় রাত্তার একদিন মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে রাত্তার লোকে ভাবিয়াছিল,

মাতাল, তারপর যখন দেখিল লোকটা মাতাল নয়, যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে তখন তাহারাই তাহাকে হাসপাতালে দিয়া আসে। ছেলেটা আরও কি সব বলিতে যাইতেছিল—অমিতাভর সে সব শুনিবার সময় ছিলনা। সে তৎক্ষণাৎ ছুটিল হাসপাতালের দিকে। অশোক এত কষ্ট পাইয়াছে, তবু তাহাদের কিছু জানায় নাই—হয়ত লজ্জায়, হয়ত আত্ম-দিক্কারের জন্যই। অমিতাভর মনে দুঃখ হইতে লাগিল এই জ্ঞাত যে,, অশোকের জীবনে যখন তাহাদের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী, তখনই তাহারা রহিল অন্তর্পন্থিত। বাপের মৃত্যুর পর ছিল তাহার মন অস্থির, ইহার উপরে আসিল নানা হিংসা ও আঘাতের পাল। সে সময় একটু সামান্য অথবা সহানুভূতি পাইলে এমন করিয়া সে নিজেকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতে পারিত না।

হাসপাতালে অশোকের ‘বেড্’ খুঁজিয়া লইতে অমিতাভর বিলম্ব হইল না। সাধারণ রোগীদের সঙ্গে লোহার খাটের উপর শায়িত অশোকের শীর্ণ শ্রান মূর্তির দিকে তাকাইয়া অমিতাভর চোখে জল আসিল। অশোক এই কয়দিন অমিতাভদের কথাই চিন্তা করিতেছিল। অমিতাভকে দেখিয়া তাহার মনে আনন্দ হইল। অমিতাভকে সে অনেক কথা বলিতে চায়। সে বলিল, “ভাই, তুমি ত সব শুনেছ?”, অমিতাভ বলিল, “ওসব কথা এখন থাক্, অশোক। কিন্তু তোর এ কি ব্যবহার ভাই, তোর এত অস্থির, এত বিপদ, আমাদের কি একবার খবর দিতে নাই! দিদি একথা শুনে কি ভাববেন বল্ দেখি—” অশোক কিছু বলিবার চেষ্টা করিল না, শুধু নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই অমিতাভ অশোকের নিকট থাকিল। তারপ্ৰাপ্ত সার্জনের সঙ্গে দেখা করিয়া জানিল, অশোক এখন ভালই আছে, আর সপ্তাহ দুই পরেই তাহার ছুটি। অমিতাভ আরও দুদিন কলিকাতায় রহিল।

হাসপাতালের নিয়মানুযায়ী বাহিরের লোক যতক্ষণ রোগীর কাছে থাকিতে পারে, ততক্ষণ সে এ কয়দিন অশোকের নিকট রহিল। অশোকের সঙ্গে কথা হইল—পনের দিন পর অমিতাভ ছুটি লইয়া আসিয়া অশোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে। সে এখনও রুগ্ন, দেহ ও মনের দিক দিয়া স্থান পরিবর্তন তাহার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অশোকের তাহাতে অমত নাই, যদিও সে ভাবিতেছিল, এই কলঙ্কিত জীবন লইয়া দিদির সামনে সে কেমন করিয়া দাঁড়াইবে!

অশোককে এই অবস্থায় কলিকাতায় ফেলিয়া যাইতে অমিতাভর অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল। কিন্তু তাহার আর থাকার উপায় ছিলনা।

পনের দিন পরে আবার সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। ডাক্তারদের সম্মতি লইয়া, সে অশোককে সঙ্গে করিয়া সেই দিনেরই ট্রেনে প্রত্যাবর্তন করিল। অশোকের শরীর ছিল তখনও দুর্বল—একজনের সাহায্য তাহার সর্বদা প্রয়োজন। অমন যে স্বদৃঢ় স্বঠাম শরীর এ কয়দিনের অবহেলা-উচ্ছ্বাসলতা ও রোগে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

(৩৩)

অশোকের ক্লিষ্ট শীর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া দিদি প্রায় কঁাদিয়া ফেলিলেন,—বলিলেন, “তোমার মায়ের গর্ভে জন্মাইনি বলেই কি আমাদের পর ভাব্লে ভাই! তোমার এত অসুখ, একখানা পোষ্টকার্ড লিখেও জানাও নি কেন?” অশোক ইহার উত্তরে শুধু দিদিকে প্রণাম করিতে গিয়া কঁাদিতে লাগিল,—বলিল, “আমি আর আপনার সে অশোক নেই দিদি, আমি মরে গিয়েছি।” দিদি বলিলেন,

“এর শাস্তি আমি দেব এই যে, যতদিন না শরীর সারে ততদিন আমার কাছ থেকে নড়তে পাবে না।”

অমিতাভ, দিদি ও লেখা সকলের মনোযোগই তাহার আসার দিন হইতে তাহার উপর পড়িল। অমিতাভ দিনের অধিকাংশ সময় কাজে বাহিরে থাকে, যে সময়টুকু বাড়ী থাকে সেটুকু ব্যয় করে শুধু অশোকের মনোরঞ্জন ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্ত। নির্দিষ্ট সময়ে আসে চা, টোস্ট, ডিম, ফল, ওভাল্টিন, গরম দুধ, ঝোলভাত ও লুচি। কোন দিন একতিল দেৱী হইবার উপায় নাই। মা মারা যাওয়ার পর হইতে এত স্নেহ ও পরিচর্যা লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। সেবা ও যত্নে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার শরীর সারিয়া উঠিল। শরীর যতদিন রুগ্ন ছিল ততদিন আর অল্প কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই। স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিতে-না-আসিতেই আত্ম-প্রাণিতে সে আবার দৃঢ় হইতে লাগিল। হায়, হায়! মিথ্যা কলঙ্ক সহ্য করিতে না পরিয়া সে করিয়াছে কি! সে যে নিজেই নিজের সর্বনাশ করিয়াছে! জগতের কত মহাপুরুষের নামে কত কলঙ্ক রটিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের কেহ ত এমন করিয়া নৈতিক আত্মহত্যা করেন নাই! অশোক এক একবার ভাবে তাহার মনের গোপন কোণে হয়ত ছিল পাপ-প্রবণতা, মিথ্যাকলঙ্ক সেই প্রবণতাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে মাত্র! তাহার ভিতরে দুশ্চরিত্র ঘুমাইয়াছিল—এই চিন্তা তাহার পক্ষে প্রীতিপদ হইল না। মনের সঙ্গে যুদ্ধ তাহার নিত্য বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। প্রতি সন্ধ্যায় অমিতাভর বান্ধলোর বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়া সীতাপুরার বন-রেখার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে ভাবিত, কি সে ছিল আর, কি সে হইতে বসিয়াছিল! লেখা ও অমিতাভর সঙ্গে বৈকালে চায়ের টেবিলে গল্প করিতে করিতে সে অন্তঃমনস্ক হইয়া পড়িত। লেখা

পূর্বের মতই অশোকের সহিত রহস্যলাপ করিত। তাহার ব্যবহারে কোথাও কৃত্রিমতার লেশমাত্রও ছিল না। অশোক কিন্তু সহজভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে পারিত না। তাহার মনে হইত, হয়ত লেখা তাহার সব কথা অমিতাভর কাছে শুনিয়াছে, —সে নিশ্চয়ই তাহাকে ঘৃণা করে। বহু চেষ্টায়ও অশোক কিন্তু ইহাদের ব্যবহারের কোন বৈষম্য ধরিতে পারিল না। মনে মনে সে বলিল, অমিতাভর মত বন্ধু সে পাইয়াছে, দিদির মত দিদি সে পাইয়াছে, এই দিক দিয়া সে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ!

লেখা ছেলেমানুষ। অশোকবাবু কেন এমন বিষন্ন হইয়া থাকেন, ইহা সে ভাল বুঝিতে পারে না। কৈ আগে ত তিনি এমন ছিলেন না! সে ভাবে, হয়ত শারীরিক অসুস্থতা তাঁহার প্রকৃতিতে আনিয়াছে এই ভয়ানক পরিবর্তন। অশোকের মনে যে অনুতাপের বহিঃ জ্বলিতোছে, দিদি তাহা বুঝিলেন। অশোকের প্রতি তাঁহার মায়া বাড়িয়া গিয়াছে। আহা! ছেলে মানুষ, আঘাতের পর আঘাত খাইয়া তাহার কি আর মাথার ঠিক ছিল! অশোক যাহাতে লজ্জিত না হয়, অথবা বুঝিতে না পারে যে, তাহার অতীত জীবন লক্ষ্য করিয়া কিছু বলা হইতেছে, এমন ভাবে তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন, ক্ষণিক বিস্মৃতি সকলেরই হয়, তাহা ক্ষমাই। পৃথিবীর বহু বরণ্য লোকেরই প্রথম জীবন পদ-স্থলনের ইতিহাস। দিদি দুপুর বেলায় কাজকর্ম সারিয়া রোজই কি একখানা বই পড়েন। অশোক একদিন বলিল, “রোজ ও কি বই পড়েন, দিদি?” দিদি বলিলেন, “চৈতন্য ভাগবত, তুমি পড়বে?” চৈতন্যদেবের কথা অশোক অনেক শুনিয়াছে বটে, কিন্তু কোন দিন তাঁহার সম্বন্ধে কোন বই পড়ে নাই। চৈতন্যদেবের ধর্মের গূঢ়ত্ব তাহার জানা নাই, যদিও সে জানে যে, বাঙ্গলার সাহিত্য ও সমাজ-জীবনে তাঁহার অভ্যুদয় এক নূতন প্রাণের ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল।

কৌতূহলী মন লইয়া সে পড়া আরম্ভ করিল। বইটী পাঠ করিয়া বৈষ্ণবধর্মের গূঢ়তত্ত্ব কিছু সে বুঝিল না বটে, কিন্তু চৈতন্যদেবের অন্তঃস্বামী চরিত্র তাহাকে মুগ্ধ করিল। পতিতের প্রতি, নীচের প্রতি কি অপার করুণা! অশোক মনে মনে ভাবিল, সেও পতিত। চৈতন্যদেব ঝাঁচিয়া থাকিলে সে তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিত, আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে উদ্ধার কর। তিনি কি তাহাকে পতিত বলিয়া ফিরাইয়া দিতেন। কখনও না! তিনি ত পাপী-তাপী কাহাকেও তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। অশোক মনে বল পাইল, চৈতন্যদেবকে বৈষ্ণবেরা বলে ভগবান। ভগবান নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিবেন। মিশনারীদের হোষ্টেলে থাকার সময় বাইবেল সে যত্ন করিয়া পড়িয়াছিল,—এইসঙ্গে তাহার মনে পড়িল যীশুখৃষ্টের উপদেশ :—

Ask, and it shall be given you, seek and you shall find ; knock, and it shall be opened unto you :

For every one that asketh receiveth ; and he that seeketh findeth ; and to him that knocketh it shall be opened.

সে ঈশ্বরের ক্ষমা চায়, তিনি কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন না? মনে মনে সে প্রতিনিয়ত বলিতে লাগিল, “ঠাকুর, আত্মানিতে আমি দগ্ধ হইতেছি, আমাকে তুমি ক্ষমা কর, আমাকে তুমি শাস্তি দাও, আমাকে তুমি পথ দেখাও।”

(৩৪)

অশোকের মনের এই অস্তুর্দ্বন্দ্ব বহুদিন ধরিয়া চলিল। যুক্তির পর যুক্তি সাজাইয়া সে নিজেকে বুঝাইল, ভ্রষ্ট জীবনের জঘ্ন ঈশ্বরের কাছে সে হয়ত ক্ষমা পাইবে, কিন্তু বিবেক এত সহজে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না। সে চায়, পাপের অন্ধার প্রায়শ্চিত্তের আগুনে পুড়িয়া উজ্জল হউক। অমিতাভের বাড়ীতে এই যে রাজভোগ—একি তাহার সঙ্গত ? প্রায়শ্চিত্ত করিতে সে প্রস্তুত, তবে তাহার নির্বাচিত প্রায়শ্চিত্ত তাহার কাছে বিভীষিকার বস্তু বলিয়া মনে হইল না—উহা তাহার চিরকালের প্রেয় বস্তু—সেবাপুত্র। পৃথিবীতে দুঃখ আছে, দৈন্ত আছে, রোগ আছে, শোক আছে—তাহার আংশিক প্রতীকারও আছে। এই প্রতীকার তাহাদেরই আয়ত্তে, জীবন-যুদ্ধে যাহারা জয়ী, সংসারে যাহারা স্প্রতিষ্ঠ। নিপীড়িত যাহারা, পতিত যাহারা তাহাদের দেখিবার কেহ নাই—অশোক তাহাদেরই একজন হইয়া তাহাদের জঘ্ন নিজের জীবন উৎসর্গ করিবে। এই শিক্ষাই সে জীবনে পাইয়াছিল। রোগশয্যায় শুইয়া যখন সে তাহার বিগত কার্যকলাপের কথা ভাবিত, তখন সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, রোগশয্যা হইতে যদি সে বাচিয়াও উঠে তবুও সে এ কলঙ্কিত জীবন আর রাখিবে না—আত্মহত্যা করিয়া পদ-স্থলনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। শাস্তমনে চিন্তা করার অবকাশ পাইল সে অমিতাভদের কাছে আসিয়া। জীবন—ঈশ্বরের দেওয়া জীবন, কেন সে নিজের হাতে নষ্ট করিবে ! যে জীবন সে পাইয়াছে তাহাকে সবার কাজে বিলাইয়া দিয়া তাহার ব্যবহার করুক। স্বেচ্ছায় সে পৃথিবীতে আসে নাই, স্বেচ্ছায় কেন এই জীবন নষ্ট করিবে ? এক এক সময় তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার পতন, এও হয়ত ঈশ্বরের নির্দেশ। তাহার মনে ছিল বিত্তের, আভিজাত্যের,

ও চরিত্রবত্তার অহঙ্কার। ঈশ্বর তাহার সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিলেন—তাহার সকল সম্পদ কাড়িয়া লইয়া। যাহাদের সেবা তাহার জীবনের ব্রত, তাহাদের চেয়ে সে বড়, মনের নিভৃতত্ব হইতে এই অভিমান যাহাতে উৎসারিত হইতে না পারে, এই জগতই সে আজ হইয়াছে দরিদ্র হইতেও দরিদ্রতম, হীন হইতেও হীনতম। তাহার পতন হয়ত বিধাতার একটা সঙ্কেতমাত্র। হীন সে, রিক্ত সে! দীনের সেবায়, বঞ্চিতের সেবায়, অত্যাচারিতের সেবায় তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত হউক। এ তাহার ক্ষণিকের বিলাস নহে—এ তাহার জীবনের চিরদিনের কামনা। লক্ষ্যভ্রষ্ট সে হইতে বসিয়াছিল, কিন্তু আজ সে দুর্বলতাকে জয় করিয়াছে।

মন স্থির করিতে অশোকের দেবী হইল না। তাহার কত কাজ! জীবনে তাহার কত প্রয়োজন, পীড়িত মানব-সমাজ তাহার অপেক্ষায়—আরামের জীবন, তৈলাক্ত মৃগ জীবন, সে আর কতকাল ভোগ করিবে! তাহার প্রাণে যে ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার উন্মাদনা যে স্থূল-ভোগ-বিলাসের চেয়ে অনেক বেশী! দিদি হস্তে দুঃখ পাইবেন, চলিয়া যাইবার নাম করিলে তাঁহার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠে, বলেন—“তোমার শরীর যে এখনও সারেনি ভাই, হাড় ক’খানা যে এখনও গোণা যাচ্ছে, কি করে তোমায় যেতে দি!” কলিকাতা যাইব বলায় যিনি এত বিচলিত হইয়া উঠেন, তাঁহাকে কি করিয়া বলা যায় তাহার নিরুদ্দেশ যাত্রার কথা! দিদি সুশিক্ষিতা, দিদি মহিয়সী তবুও স্নেহ-মমতায় তিনি সাধারণ নারীমাত্র; তাঁহাকে বলিয়া যাওয়া অসম্ভব, বাধা শুধু বাড়িয়াই যাইবে। অমিতাভ ও লেখাকেও একই কারণে কিছু বলা যায় না। তাহার মাথার ঠিক নাই বলিয়া অমিতাভ হয়ত কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিবে। অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেলে সকলে মনে আঘাত পাইবে—চিন্তাশ্রিত হইবে। দিদির অবস্থা যে

কি হইবে তাহা সে কল্পনাই করিতে পারে না ! তিনি তাহাকে নিজের ভাই-এর মতই স্নেহ করেন । কিন্তু স্নেহ কি ? সে ত মিথ্যা—মায়া ছাড়া আর কিছুই নহে । দিদি তাহাকে যদি স্নেহ করেন তবে সে বাহাতে সুখী হয় তাহাতে তাহার দুঃখিত হওয়া উচিত নয় । বাইবার সময় দিদিকে একটা চিঠি লিখিয়া সব জানাইয়া গেলেই চলিবে । দিদির জন্য তাহার মনে সত্যই কষ্ট হয়, দিদি যেন পরজন্মে সুখী হন ! অমিতাভ ও লেখা—কি সুন্দর, কি সরল, কি পবিত্র ইহাদের জীবন—জীবনে যেন তাহারা সুখী হয় !—অশোক মনে মনে এই সব প্রার্থনা করিল ।

(৩৫)

বর্ষার বারি-ধারা অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছিল । বারিধারার শব্দ শুনিতে শুনিতে অশোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল । যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন মেঘ কাটিয়া চাঁদ উঠিতেছে । নিঃশব্দে টর্চ জালিয়া অশোক দেখিল, সমস্ত বাঙ্গলোটা নিঝুম, নিঃশব্দ বাহিরের ঘরে চাপ্রাসী আচ্ছা লাল, দিব্য নাক ডাকাইতেছে । কয়েকখানা কাপড় একসঙ্গে আগে হইতেই পোটলায় বাধা ছিল । আচ্ছা লাল কিছুদিন পূর্বে তাহাকে যে বাঁশের লাঠীটা আনিয়া দিয়া তাহার ডগায় সে পোটলাটা বাধিয়া লইল, একখানা কাপড় মাথায় পাগড়ীর মত করিয়া জড়াইয়া লইয়া লাঠীটা সে হাতে লইল—তারপর আস্তে আস্তে নিঃশব্দে সে বাঙ্গলো হইতে বাহির হইল,—মনে মনে বলিল,—বিদায় দিদি, বিদায় অমিতাভ ও লেখা, বিদায় বিলাসের জীবন,—আর ভোমাদের মধ্যে কোন দিন সে ফিরিবে না । তাহার জীবনের যে অর্থ সে খুঁজিয়া পাইয়াছে, তাহারই সন্ধানে সে বাহির হইবে । প্রিয়জনের সফল সাধনা

বিচ্ছেদের বহ্নি-জ্বালা কি নিভাইয়া দিবে না? যদি পারে ভাল—না পারিলে তাহার কিছুই করিবার নাই। যে ডাক সে শুনিয়াছে, তাহাকে কেমন করিয়া সে উপেক্ষা করিবে!

রাস্তায় পা দিয়া সে দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল—প্রভাতের পূর্বে তাহাকে বহুদূরে চলিয়া যাইতে হইবে। চমৎকার—চমৎকার! গাছের ভেজা পাতায় চাঁদের আলো পড়িয়া কেমন চক্ চক্ করিতেছে! চাঁদকে যেন খানিকটা স্নান দেখাইতেছে, চাঁদ কত নিঃসঙ্গ, চাঁদ কত একাকী। শেলীর কবিতা তাহার মনে পড়িয়া গেল—

Art thou pale for weariness
Of climbing heaven, and gazing on earth,
Wandering companionless,
Among the stars that have a different birth,
And ever changing, like a joyless eye
That finds no object worth its constancy ?

চাঁদকে সে মনে মনে বলিল বন্ধু, আমিও তোমার মত একা, তোমারই মত সঙ্গীহীন। তুমি রাত্রির পর রাত্রি কাহার জগ্ন জাগিয়া কাটাইতেছ বন্ধু। কাহার জগ্ন তোমার এ বিনিদ্র সাধনা!

পরক্ষণেই বিস্তীর্ণ শূণ্যে তাহার দৃষ্টি পড়িল—আকাশে কত তারা উঠিয়াছে—ঐ ত সপ্তর্ষি মণ্ডল—তাহারই কোলের দিকে অরুন্ধতী। দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে বৃশ্চিক রাশি, আর পশ্চিম আকাশে ঐ ত অভিজিৎ নক্ষত্রকে জল জল করিতে দেখা যাইতেছে। কি সুন্দর ঝির-ঝিরে বাতাস, সীতাপুরার বনরেখা কি সুন্দরই না দেখাইতেছে! অশোকের মনে হইল, একটা অনাস্বাদিত আনন্দের শ্রোতে সে যেন অবগাহন করিতে চলিয়াছে। কিন্তু যাইবে সে কোন দিকে? মনে মনে ঠিক করিল, দক্ষিণ দেশেই সে প্রথমে যাইবে। বিদায়

পুরাতন জীবন, বিদায় অতীতের দুঃখ-বেদনা-ভুল-ভ্রান্তি! আগামী
 প্রভাতে তাহার আত্মার হইবে নব জন্ম, হে দেবতা তাকে ক্ষমা কর,
 তোমার আশীর্বাদ পথিকের উপর অজস্র ধারায় বষিত হউক।
 চলিতে চলিতে তাহার কানে কবির এইবাণী যেন বারে বারে অনুরাগিত
 হইতে লাগিল—

“মৃত্যু ভেদ করি
 ছলিয়া চলেছে তরী।
 কোথায় পৌছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
 সময় তো নাই শুধাবার।
 এই শুধু জানিয়াছে সার,
 তরঙ্গের সাথে লড়ি
 বাহিয়া চলিতে হবে তরী,
 টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
 আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল,
 বাঁচি আর মরি
 বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
 এসেছে আদেশ—
 বন্দরের কাল হল শেষ।”

—সমাপ্ত—

